Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি অর্থনীতি: রিবা ও এর বিকল্প সমাধান

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228020333

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ইসলামি অর্থনীতি: রিবা ও এর বিকল্প সমাধান

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228020333

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ইসলামি অর্থনীতি: রিবা ও এর বিকল্প সমাধান " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান, আইডিঃ 228020333 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ইসলামি অর্থনীতি: রিবা ও এর বিকল্প সমাধান " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Ishrat Jahan

(স্বাক্ষর)

ইসরাত জাহান

আইডিঃ 228020333

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ইসলামী অর্থনীতি 6

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা 6

রিবার পারিভাষিক অর্থ ও সঙ্গা 10

জাহেলি যুগে রিবা 10

ইহুদি ধর্মে রিবা 11

রিবার প্রকারভেদ ও পর্যালোচনা 13

রিবা নাসিয়্যাহর প্রচলিত রূপ ও ক্ষেত্রসমূহ: 14

রিবা আল-ফদ্বল 18

কোরআন ও হাদিসের আলোকে রিবার নিষিদ্ধতা 21

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামের পদ্ধতিসমূহ: 27

ইসলামের দৃষ্টিতে কর্জে হাসানার গুরুত্ব : 37

কর্জে হাসানার অর্থনৈতিক তাৎপর্য: 41

প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ বনাম কর্জে হাসানা: 45

সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা 46

ব্যাংকিংয়ের শরিয়তসম্মত পদ্ধতি 48

ডিপোজিটরের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক 48

ইসলামের আলোকে বিনিয়োগ পদ্ধতি: 51

শিরকাহ ও মুদারাবার কিছু জটিলতা 52

ইজারা (লিজিং সিস্টেম) 54

ঋণের দলিল 58

ঋণ পরিশোধের বিলম্বে জরিমানা 59

সময়ের পূর্বে পরিশোধে ঋণহ্রাস 62

ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতির শাখাগত সমন্বয় 62

রিবার বিকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ..64

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ 66

সুপারিশসমূহ...67

তথ্যসূত্র 69

ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা, যা মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে— আধ্যাত্মিক, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক— সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করে। ইসলামী অর্থনৈতিক দর্শন একটি ন্যায়ভিত্তিক এবং শোষণমুক্ত অর্থব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করে, যেখানে অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো নৈতিকতা, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। এই ব্যবস্থায় ধনসম্পদের সুষম বণ্টন, সম্পদের সংরক্ষণ এবং উৎপাদনশীল বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা হয়।

সুদ (রিবা) ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ, কারণ রিবা শুধু একজন ব্যক্তিকে ধ্বংস করে না, বরং পুরো সমাজে এক ধরনের আর্থিক দাসত্ব ও বৈষম্যের বীজ বপন করে। ধনী শ্রেণি আরও ধনী হয় এবং গরিবরা ঋণের বোঝায় চাপা পড়ে। ধনী ও দরিদ্রের মাঝে বৈষম্য সৃষ্টি করে এবং সমাজে শোষণের এক বৈধ পন্থা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। রিবা কেবল আর্থিক শোষণই নয়, বরং একটি নৈতিক ও সামাজিক দুর্বৃত্তপনা হিসেবেও বিবেচিত। অথচ আধুনিক বিশ্বব্যবস্থায় সুদ একটি মূল ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত, বিশেষত ব্যাংকিং ও আর্থিক খাতে। ফলে সমাজে ধনী আরও ধনী হয় এবং দরিদ্র আরও দরিদ্রতার দিকে ধাবিত হয়।এ ধরনের শোষণমূলক অর্থনীতি ইসলামি নীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

বর্তমান বিশ্বে অর্থনৈতিক সংকট, ঋণনির্ভরতা এবং বৈষম্যের মূলে যে কাঠামোগত দুর্বলতা রয়েছে, তার অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে রিবার ভিত্তিতে পরিচালিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। ইসলামি অর্থনীতি এই সংকটের বিকল্প হিসেবে একটি নৈতিক, অংশীদারিত্ব-ভিত্তিক এবং সুদমুক্ত ব্যবস্থার প্রস্তাব দেয়, যেখানে মুনাফাভিত্তিক বিনিয়োগ এবং সামাজিক দায়বদ্ধতা একইসাথে গুরুত্ব পায়।ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় রিবার পরিবর্তে মুরাবাহা, মুশারাকা, মুদারাবা, ইজারা ইত্যাদি অংশীদারিত্বভিত্তিক চুক্তির মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়, যেখানে ঝুঁকি, লাভ ও ক্ষতির ভারসাম্য বজায় থাকে। এই ব্যবস্থার লক্ষ্য হলো ন্যায্যতা ও সামাজিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা।

অতএব, এই থিসিসের মূল লক্ষ্য হলো রিবার প্রকৃতি, এর নিষিদ্ধতার কারণ এবং ইসলামি অর্থনীতিতে বিদ্যমান বিকল্প পন্থাগুলোর বিশ্লেষণ করা। এছাড়াও বাংলাদেশসহ সমসাময়িক বিশ্বের প্রেক্ষাপটে এই বিকল্প পদ্ধতির প্রাসঙ্গিকতা ও বাস্তবায়নের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে একটি সুদমুক্ত অর্থনীতির সম্ভাব্য রূপরেখা উপস্থাপন করার চেষ্টা থাকবে। এই থিসিস তাই একাডেমিক গুরুত্ব ছাড়াও বাস্তব জীবনে প্রয়োগযোগ্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করবে বলে প্রত্যাশা করা যায়।

ইসলামী অর্থনীতি

সংজ্ঞা: ইসলামি অর্থনীতির (আরবি: الاقتصاد الإسلامي) হলো কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক অর্থনৈতিক লেনদেন ব্যবস্থা।
ইসলামি অর্থনীতি হলো এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা ইসলামি শরিয়াহ ভিত্তিক নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ, ন্যায়ভিত্তিক সম্পদ বণ্টন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা এবং পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ অর্জন।
ইসলামি কৃষ্টি ও তামাদ্দুন সমৃদ্ধ যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাই ইসলামি অর্থনীতি। প্রখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী বলেন- ইসলামি অর্থনীতি হলো জনসাধারণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান। মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের যাবতীয় জাগতিক সম্পদের সামগ্রিক কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামি অর্থনীতি।
প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ডঃ এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকী বলেন- "ইসলামি অর্থনীতি সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাব"।
ডঃ এম এ মান্নান বলেন- "ইসলামি অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে"।
মাওলানা হিফযুর রহমান (র.) বলেন, "শরী'আতের পরিভাষায়, যে বিদ্যা বা জ্ঞানের মাধ্যমে এমন সব উপায় সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া যায়; যার দ্বারা ধন-সম্পদ আহরণ ও ব্যয়ের উপযুক্ত ও সঠিক ,পন্থা এবং বিনষ্ট হওয়ার প্রকৃত কারণ নির্দেশ করা হয়, তাকে 'ইসলামি অর্থনীতি' (ইলমুল ইকতিসাদ) বল হয়।

ইসলামী অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা

পরিপূর্ণ ও সর্বশ্রেষ্ঠ জীবনব্যবস্থার নাম ইসলাম। মানব জীবন যথাযথ কল্যাণময় করার জন্যই ইসলামি শরিয়ার আবিষ্কার। আরও সহজভাবে বললে ইসলামি শরিয়ার উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ সাধন করা এবং ক্ষতি ও বিশৃঙ্খলা দূর করা।ইসলামি অর্থনীতি ও ঈমান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এটি ইসলামি অর্থনীতির সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ইসলামি অর্থনীতি থেকে যদি এ বৈশিষ্ট্যকে তুলে নেয়া হয় তাহলে সেটি মুখ থুবড়ে পড়বে। সফলতার আলো দেখতে পাবে না কখনো। আর একজন মুসলিমের জীবনে কখনো ইমানহীন অর্থব্যবস্থা বা অর্থনীতিকে তার জীবনে গ্রহণ করতে পারে না বা করা উচিত না।হালাল উপার্জন ছাড়া কোনো ইবাদাত কবুল হয় না। হালাল উপার্জন এবং এর মাধ্যমে একজন মুসলিমের

পরলৌকিক সফলতা অর্জনের নিমিত্তে ইসলামী অর্থব্যবস্থা বা অর্থনীতির প্রয়োজনীয়তা অপরীসীম।

ইসলামী অর্থনীতি ইসলামী জীবনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। কারণ ইসলামী শরীয়াহ প্রধানত দুটি শাখা রয়েছে। ইবাদত ও মুআমালাত (লেনদেন ও আচার-আচরণ)। আর রাত-দিন ২৪ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে সাধারণত ২ ঘণ্টা সময় আল্লাহ্ তাআলা আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছেনে। বাকী ২২ ঘণ্টা সময় মুআমালাত-এর মধ্য দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে অতিবাহিত করতে হয়। আর মুআমালাত-এর বিশাল অংশ জুড়েই রয়েছে ইসলামী অর্থব্যবস্থা।

ইসলাম আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক উন্নয়নকেও সমানভাবে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই সম্পদ উপার্জন, রক্ষণাবেক্ষণ, সংরক্ষণ ও ব্যয়ের ক্ষেত্রে নীতিমালা দিয়ে দিয়েছে ইসলামি শরিয়া।

পবিত্র কোরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

‘অতঃপর যখন নামায আদায় শেষ হয়ে যায়। তখন তোমরা ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর দেওয়া অনুগ্রহ (রিজিক) অনুসন্ধান করো।’ (সুরা জুমুআ, আয়াত ১০)

হজরত রাসুল (সা.) বলেন, ‘অন্যান্য ফরজ আদায়ের পর হালাল রুজি অন্বেষণ করাও একটি ফরজ।’ (আল মুত্তাকি আল হিন্দ ৯২৩১)

রাসুল (সা.) আরও বলেন, ‘আর এ থেকে কিছু সম্পদ নিজের জন্য রাখো। তা তোমার জন্য উত্তম।’ (সহিহ বুখারি ২৭৫৭)

ইসলামি অর্থনীতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে এভাবে বলা যায় যে, তা হলো সম্পদ সংরক্ষণ, অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক দাসত্ব রোধ করা, মানুষের অর্থনীতিক কল্যাণ সাধন ও জীবন মান উন্নয়ন করা। সঙ্গে সঙ্গে বিনিয়োগ, উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, প্রত্যেকের অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করা এবং সহযোগিতামূলক অর্থনৈতিক পরিবেশ গড়ার পাশাপাশি দরিদ্র ও অসহায়দের অধিকার সংরক্ষণ ইসলামি অর্থনীতির আসল উদ্দেশ্য। এ সমস্ত উদ্দেশ্যের সুষম বাস্তবায়ন ও আদর্শ অর্থব্যবস্থা প্রণয়নে প্রযোজ্য যাবতীয় নীতিমালা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে কোরআন ও হাদিসে।

আল্লাহতায়ালা বলেন,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

এবং(তাদের) ধন-সম্পদে রয়েছে অভাবগ্রস্ত ও বঞ্চিততদের হক।' (সুরা যারিয়াত, আয়াত ১৯)

অন্যত্র বলা হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। কেবলমাত্র তোমাদের পরস্পরের সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা করা হয় তা বৈধ। আর তোমরা নিজেদের কাউকে হত্যা করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের প্রতি দয়ালু।(সুরা নিসা,আয়াত ২৯)

আরও বলা হয়েছে,

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

এতীমদের ধনসম্পদের কাছেও যেয়ো না; কিন্তু উত্তম পন্থায় যে পর্যন্ত সে বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়। ওজন ও মাপ পূর্ণ কর ন্যায় সহকারে। আমি কাউকে তার সাধ্যের অতীত কষ্ট দেই না। যখন তোমরা কথা বল, তখন সুবিচার কর, যদিও সে আত্নীয়ও হয়। আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর।(সুরা আনআম, আয়াত ১৫২)

সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশনা হলো,

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

তুমি একেবারে ব্যয়-কুণ্ঠ হয়োনা এবং একেবারে মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে তুমি তিরস্কৃতি, নিঃস্ব হয়ে বসে থাকবে। (সুরা বনি ইসরাইল, আয়াত ২৯)

এ আয়াতে কৃপণতা কিংবা অপচয়ে না গিয়ে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে।

আর্থিক লেনদেন ও ঋণ বিনিময়ের হিসাব সংরক্ষণ করার নির্দেশও দিয়েছে ইসলাম। ইরশাদ হয়েছে,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ

اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا
فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন। (সুরা বাকারা, আয়াত ২৮২)

প্রচলিত অর্থনীতি ও ব্যাংকিংয়ের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। যদিও প্রচলিত এই অর্থব্যবস্থা মানুষের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে বরাবরই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়ে আসছে। অর্থনৈতিক মন্দা ও সুদভিত্তিক অর্থনীতি ধনীকে বানাচ্ছে আরও ধনী আর নিঃস্ব গরিবদের করছে সর্বস্বান্ত। এক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দরিদ্র ও বেকারত্ব দূর করে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক অবস্থা তৈরির জন্য ইসলামি শরিয়াভিত্তিক প্রণীত অর্থব্যবস্থা অতীব জরুরি।

রিবার পারিভাষিক অর্থ ও সঙ্গা

রিবা (আরবি : ربا، الربا، الربٰوة ، *রিবা* অথবা *আল-রিবা*

রিবা'র আভিধানিক অর্থ : বৃদ্ধি,অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি, সুদ ইত্যাদি।

রিবা হচ্ছে আল কুরআনে নিষিদ্ধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। 'রিবা' শব্দের সাধারণ অর্থ করা হয় 'সুদ'। কিন্তু আল কুরআনে রিবার যে ধারণা এবং তা নিষিদ্ধ করার কার্যকারণ উল্লেখ করা হয়েছে তাতে 'সুদ' রিবার প্রধান প্রকার হলেও শুধুমাত্র 'সুদ' শব্দে রিবার অনুবাদ করা যথার্থ নয়। কারণ রিবা সুদের চেয়ে আরো ব্যাপক একটি বিষয়। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, কোনো ভাবে অসম বিনিময় সংঘটিত হলে তাতে যে পক্ষে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ পড়ে সে পক্ষের জন্য ঐ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশটাই হচ্ছে রিবা।

ফকীহদের পরিভাষায়,সমজাতীয় কোন পন্য বা মুদ্রা পরস্পর বিনিময় হিসেবে কম বেশি করে ক্রয় বিক্রয় করাকে রিবা বা সুদ বলা হয়।

জাহেলি যুগে রিবা

জাহিলি যুগে সুদের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। এমনকি তারা তাদের ধারণা মতে এটাকে বিশাল লাভ হিসেবে গণ্য করত। ইমাম তাবারি রহ. তদীয় তাফসির গ্রন্থে ইমাম মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন, জাহিলি যুগে তারা এমন ছিল যে, কারও ওপর কারও ঋণ থাকলে সে বলত, 'আমি তোমার পাওনা অর্থ আরও পরে শোধ করব, বিনিময়ে এ পরিমাণ অর্থ পাবে। এতে সে সম্মত হয়ে যেত।

জাহিলি যুগের লোকদের অভ্যাস ছিল, ঋণ পরিশোধের মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে ঋণদাতা ঋণগ্রহীতাকে জিজ্ঞেস করত, তুমি কি এখন ঋণ পরিশোধ করবে নাকি বেশি দেয়ার শর্তে আরও সময় নেবে ? ঋণ পরিশোধ না করলে তার ওপর বৃদ্ধির হার ধার্য করে দিত। আর ঠিক করে দিত নতুন মেয়াদ।

জাহিলি যুগে চক্রবৃদ্ধি সুদ যেমন ছিল নগদ অর্থে, গবাদি পশুর ওপরও তেমনি প্রচলিত ছিল বাৎসরিক সুদ। যদি কারও কাছে কারও ঋণের অতিরিক্ত পাওনা থাকত সে মেয়াদ পূর্ণ হওয়া মাত্র তার কাছে এসে বলত, 'তুমি কি ঋণ শোধ করে দিবে নাকি অতিরিক্তসহ পরে

দেবে ? যদি সে দিতে পারত দিয়ে দিত; নয়তো সে তার কাছে সেই উট দিত যা তার পাওনা উটের চেয়ে এক বছরের বড়। যদি তার পাওনা হত বিনতে মাখায বা এক বছরের উট সে দিত বিনতে লাবুন বা দুই বছরের উট। অতপর তার কাছে দ্বিতীয় বছর পাওনা চাইতে আসলে না দিতে পেরে হিক্কা দিত তৃতীয় বছরে। এ মেয়াদ শেষ হলে সে এলে তাকে জিযআ বা চার বছরের উট দিত। এভাবে ওপরে উঠতে উঠতে ঋণদাতা বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়ে যেত। অষ্টম বছরে তার কাছে এলে যখন সে তাও পরিশোধ না করতে পারত পরের বছর তাকে দ্বিগুণ দিত। সে বছর না দিতে পারলে তারও দ্বিগুণ দিত। যখন একশতটি হত তখন দুইশতটি দিতে হত। এ বছর দিতে না পারলে পরের বছর তাকে চারশ'টি দিতে হত। আল্লাহ তাআলা এদের কথাই বলেছেন কুরআনে কারিমে-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।(আল ইমরান ১৩০)

সুতরাং জানা গেল জাহিলি যুগে সুদকে ওই সব লাভের মধ্যে গণ্য করা হত সম্পদের মালিক যা ভোগ করে। এ ব্যাপারে সে অন্য ভাইয়ের প্রতি লক্ষ্য করে না যে, সে লাভবান হল নাকি ক্ষতিগ্রস্ত ? সে গরিব হয়ে গেল নাকি ধনী ? দৃষ্টি শুধু এক দিকেই থাকে- বিপুল সম্পদের মালিক হওয়া। এতে অন্য কেউ ধ্বংসের মুখে পড়লেও তা দেখার বিষয় নয়। তারা এমন করত তাদের অমানবিক আচরণ এবং নষ্ট চরিত্র বলেই। তাদেরকে যে চরিত্র দিয়ে পাঠানো হয়েছে তা বিকৃত হওয়ার ফলেই। এ জন্যই তাদের সমাজে কুকর্ম ও বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছিল। ছিল না সেখানে অন্যের সম্মান। ছোটরা বড়দের সম্মান দিত না। বড়রাও ছোটদের স্নেহ করত না। ধনীরাও দেখাত না গরিবদের প্রতি কোনো মমতা। সমাজের সবাই ছিল অনাচার ও হট্টগোলে দিশেহারা।

ইহুদি ধর্মে রিবা

ইহুদিরা সেই আদিকাল থেকেই ষড়যন্ত্র ও কূটকৌশল প্রিয় জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তারা তাদের কাছে প্রেরিত নবীর বিরুদ্ধে নানা কূটচাল চালত। তাদের সেসব কূটকৌশলের একটি ছিল সুদ খাওয়ার ব্যাপারে কৌশলের আশ্রয় নেয়া। অথচ তাদের নবী এ থেকে তাদের বারণ করেছেন। হারাম ঘোষণা করেছেন সুদ খাওয়া। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

আর এ কারণে যে, তারা সুদ গ্রহণ করত, অথচ এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছিল এবং এ কারণে যে, তারা অপরের সম্পদ ভোগ করতো অন্যায় ভাবে। বস্তুত; আমি কাফেরদের জন্য তৈরী করে রেখেছি বেদনাদায়ক।
(আন নিসা: আয়াত১৬১)

হাফেজ ইবনে কাসির রহ. বলেন, ‘আল্লাহ তাআলা তাদেরকে তথা ইহুদিদের সুদ খেতে নিষেধ করেন, তারপরও তারা সুদ খাওয়া থেকে বিরত থাকেনি। এজন্য তারা নানা কৌশল গ্রহণ করল। বিষয়টিকে সন্দেহের বাতাবরণে ঢেকে ফেলল আর মানুষের সম্পদ খেতে লাগল অবৈধ পন্থায়। [তাফসিরে ইবনে কাসির: ১/৫৮৪]

ইহুদিরা সুদ হারাম ঘোষণাকারী বক্তব্যকেই বিকৃত করল। তারা সে বক্তব্যের ব্যাখ্যা দাঁড় করাল এভাবে, ইহুদিদের পরস্পরের মাঝে সুদ খাওয়া নিষেধ, তবে অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে ইহুদিদের সুদী কারবার করতে কোনো বারণ নেই। রাব নামক এক ইহুদি যাজক বলে, যখন কোনো খৃস্টানের দরকার পড়বে দিরহামের, ইহুদির উচিৎ হবে সর্বদিক থেকে এ সুযোগে তার ওপর প্রভাব বিস্তার করা। তাকে আটকে ফেলা ব্যাপক লাভের বেড়াজালে। যাতে সে সম্পূর্ণভাবে পর্যুদস্ত হয়। এবং তার সম্পদের মালিকানা খর্ব হয় কিংবা তার সম্পদ এবং ঋণ সমান্তরাল হয়ে যায়। এভাবে ইহুদি খৃষ্টান ব্যক্তির ওপর কর্তৃত্ব লাভ করবে অতপর বিচারকের সহযোগিতায় তার সম্পদের অধিকার কেড়ে নিতে সক্ষম হবে।
সুতরাং আল্লাহর বাণীর আলোকে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, তিনি তাওরাত গ্রন্থেই ইহুদিদের ওপর সুদ হারাম করেছেন। তারা আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেছে এবং কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাণীর বিকৃতি সাধন করেছে। তারা মনগড়া ব্যাখ্যা স্থির করেছে যে, হারাম শুধু ইহুদিদের পরস্পরের মাঝে সুদী লেনদেন করা অন্যথায় অন্য ধর্মের লোকদের সঙ্গে সুদী কারবার করা হারাম নয়। এ জন্যই আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজিদে তাদের ভৎর্সনা করেছেন। যেমনটি জানা গেল উপরের আয়াত থেকে।

রিবার প্রকারভেদ ও পর্যালোচনা

রিবা প্রধানত দুই প্রকার :

১. ربا النسيءة রিবা আল-নাসিয়্যাহ

২. ربا الفضل রিবা আল -ফদ্বল; একে রিবাল বাইও বলা হয়।

রিবা নাসিয়্যাহর সংজ্ঞা:

নাসিয়া শব্দের অর্থ হলো বিলম্ব বা প্রতীক্ষা।

ইমাম আবু বকর জাস্সাস রাহ. বলেন,

هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض.

এমন ঋণ যাতে মেয়াদ শর্ত করা হয় এবং গ্রহিতাকে অতিরিক্ত প্রদানের শর্ত করা হয়।

-আহকামুল কুরআন ১/৫৫৭

অর্থাৎ অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে কাউকে মেয়াদি ঋণ দেওয়া। একে রিবাল করযও বলা হয়। রিবান নাসিয়্যাহ-এর আরেক প্রকার হল, রিবাদ দাইন।

রিবাদ দাইনের সংজ্ঞা : কারো থেকে কোনো পণ্যের বিক্রিলব্ধ বকেয়া-মূল্য পরিশোধের সময় হলে তখন অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়া। অর্থাৎ অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধের শর্তে সময় বাড়িয়ে নেওয়া। জাহেলী যুগে রিবা নাসিয়্যাহর উভয় প্রকারের প্রচলন ছিল খুব বেশি।

আজও এই উভয় ধরনের রিবা নাসিয়্যাহ ব্যাংকিং জগতে এবং মার্চেন্টদের সমাজে বহুল প্রচলিত।

বাজারে বিভিন্ন পণ্য কিস্তিতে বিক্রি হয়। কিন্তু কিস্তি সময়মত দিতে না পারলে একটা নির্ধারিত হারে অতিরিক্ত দেওয়ার শর্ত করা হয়। এটা রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত।

উদাহরণ :ক এক বছরের জন্য খ কে ১০০ টাকা দিল এই শর্তে যে,তাকে ১০০ টাকার সাথে অতিরিক্ত আরো ১০ টাকা দেওয়া হবে। অতিরিক্ত ১০ টাকা হলো, রিবা আল-নাসিয়্যাহ।

এভাবে টাকা ঋণের মাধ্যমে জাহেলী যুগের লোকেরা সুদি লেনদেন করত। আল্লাহ তা'আলা এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পারো।

রিবা নাসিয়্যাহর প্রচলিত রূপ ও ক্ষেত্রসমূহ:

রিবা নাসিয়্যাহকে রিবাল কুরআন, রিবাল করয ও রিবাদ দাইনও বলা হয়। প্রচলিত ব্যাংকিং সুদ এর জ্বলন্ত উদাহরণ, এছাড়াও আরো ক্ষেত্র আছে, নিম্নে একেকটি করে সবিস্তারে আলোকপাত করা হল:

১. সুদী ব্যাংক : ব্যাংকের সংজ্ঞাতেই আছে যে, ব্যাংক হল, অল্প সুদে ঋণ নেয়, আর বেশী সুদে ঋণ দেয়। সুদী ব্যাংকের কারেন্ট একাউন্ট ছাড়া সকল প্রকার একাউন্ট সুদী একাউন্ট। তাই সুদী ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট এবং সকল ধরনের ফিক্সড ডিপোজিট সুদী। চাই তা উচঝ হোক বা ঋউজ হোক অথবা সাধারণ ফিক্সড ডিপোজিট হোক; সবই রিবা নাসিয়্যাহ একাউন্ট। অনেকে মনে করেন সরকারী হলে সেটা আর সুদী হয় না। অথচ এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।
এছাড়া কারেন্ট একাউন্টেও ইদানিং সুদের মিশ্রণ দেওয়া হয়। এ ধরনের কারেন্ট একাউন্টকে SND কারেন্ট একাউন্ট বলে। এসকল একাউন্ট খোলাই সুদী চুক্তির গুনাহ। পরে সুদ গ্রহণ করলে তার গুনাহ ভিন্ন হবে।
সুদী ব্যাংকের সেভিং একাউন্ট খোলাটাই সুদী চুক্তির গুনাহ। তাই সুদ গ্রহণ না করলেও যে কোনো ধরনের সেভিং একাউন্ট করলে সুদী চুক্তির গুনাহ হবে।

২. ডি. পি. এস/ DPS ডিপোজিট পেনশন স্কীম : এটিও সম্পূর্ণ সুদী একাউন্ট।

৩. সুদী ব্যাংকের যে কোনো লোনই সুদী লোন। যেমন কার লোন, হোম লোন, হাউজ লোন, ইনভেস্টমেন্ট লোন, সিসি লোন, কৃষি লোন ইত্যাদি।

৪. প্রাইজবন্ড : সরকার প্রাইজবন্ড ছাড়ে। যা যে কোনো ব্যাংক থেকে ভাঙ্গানো যায়। একটা নির্ধারিত মেয়াদের পর লটারীর মাধ্যমে ড্র করা হয়। এরপর বিজয়ীদেরকে পুরস্কার দেওয়া হয়। এই পুরস্কারটাই রিবা নাসিয়্যাহ বা সুদ। প্রাইজবন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে ব্যাংককে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে। আর ব্যাংক প্রাইজ বা পুরস্কার দেয়ার নামে ক্রেতাকে সুদ দিচ্ছে।

৫. ক্রেডিট কার্ড : ক্রেডিট কার্ড মূলত এক প্রকার সুদভিত্তিক লোন কার্ড। কেননা এই কার্ডের চুক্তিপত্রেই লেখা রয়েছে যে, মিনিমাম ডিউ টাইমে/ডেটে বাকী পরিশোধ না করলে প্রতিদিন নির্দিষ্ট হারে সুদ দিতে হবে। যার ফলে অধিকাংশ ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারই সুদের আওতায় পড়ে যান। এই সুদ রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত, যা রিবা নাসিয়্যাহ। তাই সুদ থেকে

বাঁচতে হলে অবশ্যই যথাসময়ে বাকী পরিশোধ করে দিতে হবে। তাহলে আর সুদী কারবার হবে না।

৬. ক্রেডিট কার্ড দ্বারা এটিএম থেকে টাকা উত্তোলন করলে যে চার্জ নেওয়া হয় তা সুস্পষ্ট সুদ। কেননা কার্ডের ফি তো নিচ্ছেই। এখন অতিরিক্তটা ঋণের বিনিময়ে হচ্ছে।

৭. বন্ড : সরকারী এবং বেসরকারী বন্ড। এগুলো সম্পূর্ণ রিবা নাসিয়্যাহ। সরকারী হওয়ার কারণে কিংবা নির্দিষ্ট কোনো বাণিজ্যিক প্রকল্প, কোনো কোম্পানী বা রাস্তা-ঘাট কিংবা ব্রীজ নির্মাণের জন্য ঋণ নেওয়া হচ্ছে এমন কথা উল্লেখ করার কারণে কেউ কেউ মনে করতে পারেন যে, এটা সুদী হবে না, কিন্তু এ ধারণা ভুল। স্টক এক্সচেঞ্জ বা বাংলাদেশ ব্যাংকসহ অন্য যে কোনো ব্যাংকে যে বন্ড ক্রয়-বিক্রয় হয় তাতে সুনির্দিষ্ট সুদের ঘোষণা দেওয়া থাকে। এ সকল বন্ডও সুদী বন্ড।

৮. স্টুডেন্ট লোন : বিভিন্ন ব্যাংক কর্তৃক স্টুডেন্ট লোন দিয়ে যা অতিরিক্ত নেওয়া হয় সেটাও সুদ। এটি ইন্টারেস্ট বা সার্ভিস চার্জ যে নামেই নেওয়া হোক না কেন।

৯. লটারী : রেডক্রিসেন্ট বা এজাতীয় সরকার অনুমোদিত কিছু প্রতিষ্ঠান দশটাকা বিশটাকা মূল্যের লটারী টিকেট ছাড়ে। এক লক্ষ, দুই লক্ষ টাকা, গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে লাখ লাখ টাকা নেয়া হয়।
এক্ষেত্রে পুরস্কার পায় কেবল দু’তিনজন। আর বাকিরা কিছুই পায় না। তাদের মূল টাকাই গচ্চা যায়। এধরনের লেনদেনকেই শরীয়তের ভাষায় ‘কিমার’ বলে। যা সম্পূর্ণ হারাম। আর এক্ষেত্রে সবাই তো অতিরিক্ত পাওয়ার উদ্দেশ্যেই দশ-বিশ টাকায় লটারি ক্রয় করে থাকে। যদিও কেউ পুরস্কার পায় আর কেউ পায়া না। তাই এতে সুদও বিদ্যমান।

১০. পোস্ট অফিসের সঞ্চয়পত্র : পোস্ট অফিসের মাধ্যমে সরকারীভাবে বিভিন্ন নামের সঞ্চয়পত্র স্কীম রয়েছে। এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পূর্ণ সুদী, রিবা নাসিয়্যাহ-এর অন্তর্ভুক্ত।

১১. জমি বন্ধক : বাংলাদেশের প্রায় সকল এলাকায় বহুল প্রচলিত লেনদেন হল, জমি বন্ধক রীতি। জমির মালিক একটা মোটা অংকের টাকা নেয়। বিনিময়ে বন্ধক গ্রহীতা জমিটি ভোগ করে এবং মেয়াদান্তে মালিক পুরো টাকা ফেরত দিয়ে জমিটি বুঝে নেয়। এক্ষেত্রে ঋণ গ্রহিতার জন্য বন্ধকি জমি ভোগ করা রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত, যা হারাম। কোনো কোনো এলাকায় এটাকে জমি কট দেওয়াও বলে। আবার কেউ জমি খায়খালাসি দেওয়া বলে। নাম যাই হোক লেনদেন এবং হুকুম একই।

১২. বাড়ি বন্ধক : জমি বন্ধকের মত ঢাকা শহরে বাড়ি বন্ধকের প্রথা চালু হয়েছে। তা হল, বাড়িওয়ালা নিজ প্রয়োজনে ৫ বা ১০ লক্ষ টাকা ঋণ নেয়। বিনিময়ে পাঁচ বছর বা দশ বছর ঋণদাতাকে তার ফ্ল্যাটে বিনা ভাড়ায় থাকার সুযোগ দেয়। পরবর্তীতে যখন ঋণ পরিশোধ করে দিবে তখন এই চুক্তি সমাপ্ত হবে। এই লেনদেনও সম্পূর্ণ সুদী ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। যা সুস্পষ্ট হারাম। কেননা ঋণের কারণেই এ সুবিধা পাচ্ছে।

১৩. বাড়ি ভাড়ার ক্ষেত্রে সিকিউরিটি বেশি দিলে ভাড়া কমিয়ে দেওয়া : বাড়ি বন্ধকের উপরোক্ত পদ্ধতি নাজায়েয হওয়ার কারণে অনেকে হীলা হিসাবে এ পদ্ধতি চালু করেছে। যেমন, কোনো বাড়িওয়ালার টাকার প্রয়োজন । যেখানে সাধারণ হিসেবে অগ্রিম নেয়ার কথা ২০ হাজার টাকা, কিন্তু এর স্থলে বাড়িওয়ালা পাঁচ লক্ষ টাকা সিকিউরিটি মানি দাবি করে এবং এর বিনিময়ে ভাড়া কমিয়ে দেয় (যেমন, সাধারণ হিসেবে ভাড়া যদি হয় ১০ হাজার টাকা এক্ষেত্রে ভাড়া হবে ১/২ হাজার টাকা)- এটাও হারাম। কেননা ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই মূলত তার থেকে ভাড়া কম নিচ্ছে। এই ঋণকে ছুতা হিসেবে সিকিউরিটি মানি বলা হয়েছে। মূলত সিকিউরিটি মানি তো সেটাই যা সচরাচর সবাই দিয়ে থাকে। যা দিলে ভাড়া কমানো হয় না। ভাড়া স্বাভাবিকই থাকে। নাম যাই দেওয়া হোক ফেরতযোগ্য ৫ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়ার কারণেই ১০ হাজার টাকার ভাড়া ১/২ হাজারে নেমে এসেছে।
ফাযালা বিন উবাইদ রা. বলেন, যেই ঋণ কোনো মুনাফা নিয়ে আসে তা রিবার প্রকারসমূহের একটি। -সুনানে বাইহাকী ৫/৩৫০
ইমাম মালেক রাহ. বর্ণনা করেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বস্তু ঋণ দিবে সে যেন অতিরিক্ত কোনো কিছু শর্ত না করে। যদিও এক মুঠো ঘাস হোক না কেন। -মুআত্তা মালেক, হাদীস ২৫১৩

১৪. ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড : সরকারী বা বেসরকারী ঐচ্ছিক প্রভিডেন্ট ফান্ড সুদী ফান্ড। ঐচ্ছিক হওয়ার কারণে এতে টাকা জমা দেওয়ার অর্থ ঋণ দিয়ে পরবর্তীতে অতিরিক্ত নেওয়া। আর এটাই রিবা নাসিয়্যাহ। আর পুরো সরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের বাধ্যতামূলক যে অংশ এই ফান্ডে কেটে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে এর সাথে অতিরিক্ত যে অংশ দেওয়া হয় তা সুদ নয়। তা নেওয়া জায়েয। তবে সরকারী প্রতিষ্ঠানে বাধ্যতামূলক কেটে রাখার পাশাপাশি ঐচ্ছিকও কিছু কাটানোর সুযোগ থাকে। এক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত অংশ কাটানো সুদী চুক্তির অন্তর্ভুক্ত এবং এই অতিরিক্ত কর্তিত অংশের উপর উদ্বৃত্ত যা দিবে তা সুদ। তা নেওয়া বৈধ হবে না। তাই বাধ্যতামূলকের অতিরিক্ত উক্ত ফান্ডে জমা রাখাও জায়েয হবে না। কেননা ঐচ্ছিক অংশ রাখার অর্থই হল সুদী চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়া। এছাড়া স্বায়ত্ত¡শাসিত প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রভিডেন্ট ফান্ডের সকল টাকা সুদী ব্যাংক বা বীমাতে রেখে বৃদ্ধি করা হয়। পরবর্তীতে সেটিই তাদেরকে দেওয়া হয়।

তাই এসকল প্রতিষ্ঠানের ঐচ্ছিক ও বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ডে জমার অতিরিক্ত নেওয়া জায়েজ হবে না। কেননা সেগুলোও সুদের অন্তর্ভুক্ত।

১৫. লাভের হার নির্ধারণ না করে নির্দিষ্ট পরিমাণ মুনাফা প্রদানের শর্তে বিনিয়োগ করা: ব্যাংক ছাড়াও ব্যক্তি পর্যায়ে ব্যবসায়ীদেরকে ব্যবসার জন্য টাকা প্রদান করে লাভ হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দেওয়ার শর্ত করা হয় এটাও সম্পূর্ণ সুদী লেনদেন ও সুদী বিনিয়োগ। ব্যবসার জন্য দেওয়া আর লাভ দেওয়ার কথা হলেই অনেকে মনে করেন তা ইসলামী হয়ে যায়; সুদী থাকে না। অথচ ব্যবসার জন্য টাকা দিয়ে নির্ধারিত অংকের কিছু দেওয়ার চুক্তি বা শর্ত করাই সুদ ও রিবা নাসিয়্যাহ। এক্ষেত্রে হালালভাবে বিনিয়োগ করতে চাইলে ব্যবসার প্রকৃত লাভের শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে লাভ হলে নির্ধারিত অংশ অনুযায়ী ভাগ পাবে। আর লাভ না হলে পাবে না।
কিন্তু পূর্বোক্ত লেনদেনে লাভ হিসেবে নির্দিষ্ট কিছু দেওয়ার কথা হলে চুক্তি অনুযায়ী সে তা দিতে বাধ্য থাকে। লাভ হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় তাকে তা দিতেই হয়। এটাই সুদ। তদ্রূপ কোনো কিছু নির্দিষ্ট না করে এমনিতেই ব্যবসার জন্য কাউকে টাকা দেওয়া। এক্ষেত্রে কথা হয় যে, লাভ হিসেবে প্রতিমাসে কিছু কিছু দিবে। এটাও সুদী চুক্তি এবং রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত।

১৬. জুয়েলারী দোকানে স্বর্ণ বন্ধক রেখে সুদের উপর লোন প্রদান করা হয়। তেমনিভাবে ব্রাক, আশা, গ্রামের মহাজন সুদের ভিত্তিতে লোকদেরকে লোন দিয়ে থাকে। এগুলো সবই রিবা নাসিয়্যাহ।

১৭. ফরম বিক্রির ছুতায় রিবা নাসিয়্যাহ : কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা সোসাইটি মানুষকে সুদবিহীন লোন দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়। কিন্তু তাদের নিয়ম হল, ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী ফরম কিনতে বাধ্য করা হয় আর ঋণের হার অনুযায়ী ফরমের দাম কম-বেশি হয়। যেমন, দশ হাজার টাকা ঋণের জন্য পাঁচশত টাকার ফরম ক্রয় করতে হয়। আর বিশ হাজার টাকার জন্য এক হাজার টাকার ফরম ক্রয় করতে হয় । আর নির্ধারিত মেয়াদের ভেতর তা পরিশোধ না করলে পরে আবারও আরেকটি ফরম ক্রয় করে পূরণ করতে হয়। বাহ্যিকভাবে এটি ফরম ক্রয়-বিক্রয়। কিন্তু এর মাধ্যমেই সুদ অগ্রীম আদায় করে নেওয়া হচ্ছে। এজন্যই ঋণের পরিমাণ বাড়লে ফরমের মূল্যও বাড়তে থাকে। এটা হচ্ছে রিবা নাসিয়্যাহ গ্রহণের হীলা-বাহানা ও ছুতা অবলম্বন।

১৮. কিস্তি-বিক্রি : বাজারে ফ্রিজ, কম্পিউটার ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী কিস্তিতে বিক্রি হয়। এই বিক্রির চুক্তিপত্রের মধ্যেই উল্লেখ থাকে সময়মত পরিশোধ করতে না পারলে একটা

নির্দিষ্ট হারে সুদ বাড়বে। এটা রিবাদ দাইন ও রিবা নাসিয়্যাহর অন্তর্ভুক্ত। তাই এ ধরনের শর্ত সম্পূর্ণ নাজায়েয। আর বাধ্য হয়ে কেউ এধরনের শর্তে ক্রয় করলে নির্ধারিত মেয়াদের ভেতরই কিস্তি পরিশোধ করতে হবে। নতুবা সুদ দেওয়ার গুনাহ হবে। অতএব এ ধরনের ক্ষেত্রে সুদ থেকে বাঁচতে চাইলে যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ করে দিতে হবে।

১৯. ইনস্টাবাই : Instabuy বিভিন্ন কোম্পানী ক্রেডিট কার্ড হোল্ডারকে বিনা সুদে এবং অতিরিক্ত মূল্য ছাড়া ২/৩ বা ১২ কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধা দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রেও যথাসময়ে মূল্য পরিশোধ না করলে অতিরিক্ত সুদ দিতে হয়। এতে কারবারটি সুদী কারবারে পরিণত হয়ে যায়। তাই ইনস্টাবাই-এর সুবিধা গ্রহণ করলেও যথাসময়ে কিস্তি পরিশোধের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। অন্যথায় কারবার সুদী হয়ে যাবে। অর্থাৎ রিবাদ দাইনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

রিবা আল-ফদ্বল

রিবা আল-ফদ্বেলর সংজ্ঞাঃ

এটা পণ্যসামগ্রী বিনিময়ের ক্ষেত্রে কমবেশি করার সাথে সম্পৃক্ত। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে, পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয়, রিবা আল-ফদ্বল।

উবাদাহ বিন সামিত (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন

الذَّهبُ الذَّهبِ،وَالْفِضّةُ بِالْفِضَّةِ،وَالْبُرُّ بالْبُرّ،وَالشَّعِيرُ بالشَّعِيرِ،وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يدًا بِيَدٍ، فَاذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْءَصْنَافُ فَبِيعُوا كيْفَ شِءْتُمْ اءِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. فمن زاد ءو استزاد فقد ءربي| رَوَاهُ مُسْلِم،

রসূলুল্লাহ(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, "সোনার বদলে সোনা, রূপার বদলে রূপা, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর ও লবণের বদলে লবণ লেনদেন (কম-বেশি না করে) একই রকমে সমপরিমাণে ও হাতে হাতে অর্থাৎ নগদে বিক্রয় চলবে।যখন ঐ বস্তুগুলোর মধ্যে প্রকারভেদ থাকবে, তখন নগদে তোমরা ইচ্ছানুযায়ী বিক্রয় কর।"[সহীহ মুসলিম; ১৫৮৭]

প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, একজন বিলাল রা. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সামনে কিছু উত্তম মানের খেজুর নিয়ে উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ

(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কোথা থেকে এটি আনলে?" তিনি বললেন, "আমাদের খেজুর নিকৃষ্টমানের ছিল। আমি তার দুই সা'র (মাপে) বিনিময়ে এক সা' উন্নতমানের বারমী বদলিয়ে নিয়েছি।" রাসূলুল্লাহ সা. বললেন,

اَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَينُ الرِّبَا، لَا تَفْعَل وَلكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبعِ التَمَرَ بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ

'ওহ! এতো নির্ভেজাল সুদ, এতো নির্ভেজাল সুদ, কখনো এরুপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, তাহলে নিজর খেজুর বাজারে বিক্রি করবে, তারপর উন্নতমানের খেজুর কিনে নিবে।'

অন্য এক হাদীছে হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. উল্লেখ করেছেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

الذَّهَبُ بالذَّهَبِ، الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمَرُ بِالتَّمَرِ، وَالْمِلْح بِهِ الْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ، يدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى، الْآخِذُ وَ الْمُعْطِيْ فِيهِ سَوَاءٌ

'সোনার বিনিময়ে সোনা, রূপার বিনিময়ে রূপা, গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং উপস্থিত ক্ষেত্রে হাতে হাতে। যে ব্যক্তি বেশি দিয়েছে বা নিয়েছে সে সুদি কারবার করেছে। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা উভয়েই সমান'।

উল্লিখিত ছয়টি পণ্য কম-বেশি করে পণ্যের বিনিময়ে (একই-জাতীয়) পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করাকে, হাদিসে রিবা বা সুদ বলা হয়েছে।

তাই ইসলামে এই ধরনের লেনদেন তথা রিবা নিষিদ্ধ। অতএব কুরআন কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।
সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের ভাষ্য আলোচনা:
প্রথম আয়াত:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

যারা সুদ খায়, তারা কিয়ামতে দন্ডায়মান হবে, যেভাবে দন্ডায়মান হয় ঐ ব্যক্তি, যাকে শয়তান আসর করে মোহাবিষ্ট করে দেয়। তাদের এ অবস্থার কারণ এই যে, তারা বলেছেঃ ক্রয়-বিক্রয় ও তো সুদ নেয়ারই মত! অথচ আল্লা'হ তা'আলা ক্রয়-বিক্রয় বৈধ করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন। অতঃপর যার কাছে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, পূর্বে যা হয়ে গেছে, তা তার। তার ব্যাপার আল্লাহর উপর নির্ভরশীল। আর যারা পুনরায় সুদ নেয়, তারাই দোযখে যাবে। তারা সেখানে চিরকাল অবস্থান করবে।[সূরা বাকারা;২:২৭৬]

দ্বিতীয় আয়াতঃ

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোন অবিশ্বাসী পাপীকে

[সূরা বাকারা২:২৭৬]

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন।আর সদকা দানকারীর অর্থ সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যে সমস্ত বকেয়া আছে, তা পরিত্যাগ কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক।[সূরা বাকারা ২:২৭৮]

وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

অতঃপর যদি তোমরা পরিত্যাগ না কর, তবে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হয়ে যাও। কিন্তু যদি তোমরা তওবা কর, তবে তোমরা নিজের মূলধন পেয়ে যাবে। তোমরা কারও প্রতি অত্যাচার করো না এবং কেউ তোমাদের প্রতি অত্যাচার করবে না। [সূরা বাকারা ২:২৭৯]

পঞ্চম আয়াতঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ খেয়ো না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কল্যাণ অর্জন করতে পার।[আল-ইমরান৩:১৩০]

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে।তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে রিবার নিষিদ্ধতা

বর্তমানকালে সুদ সম্পর্কিত লেনদেন ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি বিরাট অংশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে। বড় আকারের প্রায় সকল ব্যবসা-বাণিজ্য নির্ভরশীল হয়ে গেছে সুদী লেনদেনের উপর। এ কারণে সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসের বর্ণনাগুলো যখন সামনে আসে তখন তা বুঝতে, বুঝাতে এবং মেনে নিতে অনেকের মনে দ্বিধা-সংশয়ের সৃষ্টি হয়। অনেকে এক্ষেত্রে নানা রকম কৌশলের আশ্রয় নিতে চেষ্টা করেন। এটা কোনো মুমিন-মুত্তাকীর জন্য আদর্শ পন্থা নয়। সুতরাং সকলের উচিত আল্লাহ তাআলার ভয়কে মাথায় রেখে পরকালের কথা চিন্তা করে ঠান্ডা মাথায় বিষয়টি বুঝতে চেষ্টা করা, এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা এবং পবিত্র কুরআন ও হাদীসের নির্দেশনা শিরোধার্য করে নিয়ে নিজেদের কর্মজীবনের গতিপথ নির্ণয় করা এবং পরকালের পথ সুগম করা।
রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুওত লাভ এবং কুরআনে কারীম অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে আরবের জাহেলী যুগেও ‘রিবা’ শব্দটি প্রচলিত ছিল। শুধু তাই নয়, সে সময় রিবা অর্থাৎ সুদের লেনদেনও চালু ছিল। সূরা নিসার আয়াত থেকে জানা যায় যে, হযরত মূসা আ.-এর যুগেও ইহুদীদের মধ্যে সুদের লেনদেনের রেওয়াজ ছিল এবং মূসা আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত গ্রন্থ তাওরাতেও ‘রিবা’ অর্থাৎ সুদের লেনদেনকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।
সুতরাং যে শব্দটি প্রাচীনকাল থেকে আরব ও তার আশপাশের এলাকায় পরিচিত ছিল এবং সে অনুযায়ী লেনদেনের রেওয়াজ ছিল, পবিত্র কুরআনে এর প্রতি নিষেধাজ্ঞা বর্ণনা করার পাশাপাশি এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মূসা আ.-এর উম্মতের জন্যও রিবা তথা সুদ হারাম করা হয়েছিল; তাই তা এমন কোনো বিষয় নয়, যা কুরআন নাজিল হওয়ার সময় সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে বুঝা বা বুঝানো কঠিন ছিল। তারা সকলেই রিবার হাকীকত বুঝতেন। তাদের কাছে একথা স্পষ্ট ছিল-

كل قرض جر نفعا فهو ربا.

(যে ঋণ ঋণদাতার জন্য কোনো ধরনের মুনাফা বয়ে আনে সেটাই রিবা।)

এ কারণে অষ্টম হিজরীতে সূরা বাকারার রিবা সম্পর্কিত আয়াতগুলো যখন নাযিল হয় তখন সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে রিবা'র নিষেধাজ্ঞা বিষয়ক বিধান বুঝতে এবং মেনে নিতে কোনোরূপ বেগ পেতে হয়নি। মদ্যপানের প্রতি নিষেধাজ্ঞা যেমন তাঁরা নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন, তেমনি রিবা সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা নাজিল হওয়ার পর তাও তাঁরা অকপটে মেনে নিয়ে সবধরনের সুদী লেনদেন ছেড়ে দিয়েছিলেন।

ইসলাম রিবা'র নিষেধাজ্ঞার বিষয়টিকে কেবল নৈতিক বিবেচনার অধীনে রাখেনি; বরং তাকে পুরোপুরি আইনের মর্যাদা দিয়েছে। এ বিষয়ে বিদায় হজে¦ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐতিহাসিক ভাষণের সংশ্লিষ্ট অংশটুকু বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। নবীজী বলেছেন-

أَلَا كُلّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيّةِ تَحْتَ قَدَمَيّ مَوْضُوعٌ،... وَرِبَا الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعٌ، وَأَوّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطّلِبِ، فَإِنّهُ مَوْضُوعٌ كُلّه.ُ

সাবধান! জাহেলিয়্যাতের প্রত্যেক বিষয় আমার দু'পায়ের নীচে।... জাহেলীযুগের 'রিবা' বাতিল। আর প্রথম রিবা, যা আমরা বাতিল করছি তা আমাদের রিবা; আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের রিবা। তা পুরোটাই বাতিল। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১২১৮

বর্তমান পৃথিবীতে দু'ধরনের সুদী লেনদেন বেশি প্রচলিত। এক. মহাজনী সুদ, অর্থাৎ কেউ কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে কারও নিকট থেকে ঋণ নিলে এর বিপরীতে ঋণের অতিরিক্ত যে অর্থ নেওয়া হয়। দুই. বাণিজ্যিক সুদ, যা কোনো উৎপাদনমূলক কাজে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়।

পবিত্র কুরআন ও হাদীসের স্পষ্ট বর্ণনা- সর্বপ্রকার সুদ হারাম। কেউ কেউ প্রতারণা করে বলে থাকেন যে, পবিত্র কুরআনে যে 'রিবা' তথা সুদকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, তার দ্বারা প্রথম প্রকারের সুদ অর্থাৎ মহাজনী সুদ উদ্দেশ্য, যা কোনো সাময়িক বা ব্যক্তিগত প্রয়োজনে গৃহীত ঋণের বিপরীতে নেওয়া হয়। তারা এই ধোঁকার ভিত্তি রেখেছে আরেক মিথ্যা দাবির উপর। তারা বলে, কেবল এ ধরনের সুদই নাকি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে এবং পূর্ববর্তী জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল। তাই এরূপ সুদকেই কুরআনে কারীমে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্তমান যুগে প্রচলিত বাণিজ্যিক সুদ (commercial intarest)-এর রেওয়াজ এবং লেনদেন নাকি সে যুগে ছিল না। সুতরাং তাদের ধারণা মতে এরূপ সুদ কুরআনে কারীমে বর্ণিত নিষেধাজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত নয়।

আসলে বিষয়টি এমন নয়। প্রথমত এ ধারণা ঠিক নয় যে, রিবা'র যে পদ্ধতি জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল না, তা হারাম নয়। কেননা, ইসলাম যখন কোনো জিনিষকে হালাল বা হারাম সাব্যস্ত করে তখন তার একটি নির্দিষ্ট পরিচয় থাকে। সেই পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে শরীয়তের বিধান আরোপিত হয়। নিছক পন্থা-পদ্ধতি পরিবর্তন হওয়ার কারণে বিধান পরিবর্তন হয় না। উদাহরণত কুরআনে কারীমে মদকে হারাম করা হয়েছে। কুরআন নাযিল হওয়ার সময় মদ প্রস্তুত করার যেসব পন্থা-পদ্ধতি ছিল তার সবই হয়ত পরিবর্তিত হয়ে গেছে, কিন্তু মদ তো ঠিকই রয়ে গেছে, তাই মদ হারাম হওয়ার বিধানও বদলায়নি। এমনিভাবে অশ্লীল কর্মকান্ড কুরআন নাযিল হওয়ার সময় একরকম ছিল, বর্তমানকালে তার ধরন অনেক পাল্টে গেছে, তবু অশ্লীলতার নিষেধাজ্ঞা বহাল রয়েছে। সুদ জুয়া'র অবস্থাও তাই। এখন যদি সুদকে আধুনিক ব্যাংকিং অর্থব্যবস্থা বলে এবং জুয়াকে লটারী বলে বৈধ মনে করা হয় তাতে তো শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলোকে বৈধ বলা যাবে না।

একবার নাকি কোনো ভারতীয় নামকরা সঙ্গীতশিল্পী এক আরব বেদুইনের গান শুনে বলেছিল, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের গান শোনার কারণেই গানকে হারাম বলেছেন। এরূপ বেসুরো গান হারাম হওয়ারই কথা। আমাদের গান শুনলে কখনও তিনি গানকে হারাম বলতেন না।

কুরআনে কারীমে বর্ণিত সুদের নিষেধাজ্ঞাকে জাহেলী যুগের প্রচলিত বিশেষ কোনো সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য মনে করাও ঠিক এমনই।

এছাড়া কমার্শিয়াল ইন্টারেস্ট বা বাণিজ্যিক সুদ জাহেলী যুগে প্রচলিত ছিল না- এমন নয়; বরং তখনও এধরনের বাণিজ্যিক সুদ লেনদেনের রেওয়াজ ছিল। সেযুগে সমাজের বড় বড় ব্যবসায়ীরা সুদভিত্তিক লেনদেনে বর্তমানকালের ব্যাংকের মতো ভূমিকা পালন করত। এছাড়া এক গোত্রের ব্যবসায়ীরা নিজ গোত্রের বা অন্য গোত্রের ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে মোটা অংকের সুদী ঋণ নিয়ে ব্যবসার কাজে খাটাত। কখনও বা সুদী ঋণ নিয়ে ফসল উৎপাদনের কাজে লাগত। হাদীস ও তাফসীরের বিভিন্ন কিতাবে আছে, আম্র ইবনে আওফের গোত্র মুগীরার গোত্রের নিকট থেকে ঋণের বিপরীতে সুদ গ্রহণ করত আর মুগীরার গোত্র তা পরিশোধ করত। এভাবে জাহেলী যুগে তাদের লেনদেন চলত। ইসলামের আগমনের পরও মুগীরার গোত্রের কাছে আম্র-এর গোত্রের মোটা অংকের সুদ পাওনা ছিল (যা বাতিল করা হয়েছিল)।

উক্ত বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এসব সুদী লেনদেন মূলত ব্যক্তিগত পর্যায়ের কোনো অভাব বা অর্থসংকটের কারণে ছিল না, যাকে 'মহাজনী সুদ' নামে অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সুদী লেনদেন।

এছাড়া তখনকার আরবের লোকেরা কখনও গোত্রের সাধারণ মানুষের অর্থকড়ি এক জায়গায় একত্র করে সেগুলো ব্যবসার কাজে লাগাত। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার পেছনে যে

কাফেলার বিষয়টি ছিল, সেটিও ছিল একটি ব্যবসায়ী পণ্য আমদানিকারক কাফেলা। সে ব্যবসায় কুরায়শের সকল মানুষের অর্থ লগ্নি করা ছিল।

সহীহ বুখারীতে আছে, হযরত যুবায়র ইবনুল আওয়াম সে যুগের বেশ বড় ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর আমানতদারির সুনামও ছিল সবার কাছে প্রসিদ্ধ। এজন্য অনেকে তাঁর কাছে অর্থ আমানত রাখতে আসত। তিনি সেগুলো আমানত হিসাবে না রেখে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করতেন, যাতে মালিকের অর্থ ফেরত পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে। এরপর তিনি এসব অর্থ নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতে খাটাতেন। ইনতেকালের সময় তাঁর কাছে মানুষের প্রাপ্য ঋণ ছিল বাইশ লক্ষ দেরহাম। তখনকার সময়ের হিসাবে এ পরিমাণ অর্থকে ছোটখাটো পুঁজি বলা যায় না। এসব ঋণ তাঁর ইনতেকালের পর তাঁর রেখে যাওয়া অর্থ-সম্পদ থেকে পরিশোধ করা হয়েছিল। এগুলো ছিল মূলত তাঁর ব্যবসায়িক ঋণ। সুতরাং এ কথা বলা যে, সে যুগে ব্যবসায়িক ঋণের রেওয়াজ ছিল না- ঠিক নয়।

এ ছাড়া আরও অনেক নজির ইতিহাসে পাওয়া যায়। অতএব কুরআনে কারীমে সুদের প্রতি যে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে তা সর্বপ্রকার সুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন আমরা দেখি, সুদ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে কারীমের ভাষ্য-

প্রথম আয়াত :

اَلَّذِيْنَ يَاْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ۘ وَ اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰوا فَمَنْ جَآءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَ وَ اَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَ مَنْ عَادَ فَاُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ.۝

যারা সুদ খায় তারা (কিয়ামতের দিন) সেই ব্যক্তির মতো দাঁড়াবে, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ক্রয়-বিক্রয় তো সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম। যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং সে বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই। আর তার ব্যাপার আল্লাহর এখতিয়ারে। আর যারা পুনরায় করবে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী হবে। সেখানে তারা হবে চিরস্থায়ী। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৫

দ্বিতীয় আয়াত :

يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ وَ اللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ اَثِيْمٍ.۝

আল্লাহ সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দানকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনো অকৃতজ্ঞ পাপীকে ভালোবাসেন না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৬

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সুদ থেকে অর্জিত অর্থ বা তার বরকত নষ্ট করে দেন। আর সদকা দানকারীর অর্থ-সম্পদ বা তার বরকত বৃদ্ধি করে দেন।

তৃতীয় ও চতুর্থ আয়াত :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَ ذَرُوْا مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبٰوا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُوْنَ وَ لَا تُظْلَمُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুদের যা বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হও।

যদি তোমরা না ছাড় তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা শুনে নাও। আর যদি তোমরা তাওবা কর তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই। এতে তোমরা (কারও প্রতি) জুলুম করবে না এবং তোমাদের প্রতিও জুলুম করা হবে না। -সূরা বাকারা (২) : ২৭৮-২৭৯

পঞ্চম আয়াত :

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا اَضْعَافًا مُّضٰعَفَةً وَّ اتَّقُوا اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ.

হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। -সূরা আলে ইমরান (৩) : ১৩০

এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, কুরআন নাজিল হওয়ার সময় আরবে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার রেওয়াজ ছিল। তা দূর করার জন্য এ আয়াতে চক্রবৃদ্ধি আকারে সুদ খেতে নিষেধ করা হয়েছে। তার মানে এ নয় যে, চক্রবৃদ্ধি আকারে না হলে সুদ খাওয়া হালাল হয়ে যাবে। কারণ, অন্যান্য আয়াতে তো যে কোনো রকমের সুদ খাওয়াকে হারাম করা হয়েছে।

ষষ্ঠ ও সপ্তম আয়াত :

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبٰتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ كَثِيْرًا وَّ اَخْذِهِمُ الرِّبٰوا وَ قَدْ نُهُوْا عَنْهُ وَ اَكْلِهِمْ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا.

ভালো ভালো যা ইহুদীদের জন্য বৈধ ছিল আমি তা তাদের জন্য অবৈধ করেছি; তাদের সীমালংঘনের জন্য, আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের সুদ গ্রহণের জন্য, যদিও তা তাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছিল; এবং অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার জন্য। তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদের জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। -সূরা নিসা (৪) : ১৬০-১৬১

উক্ত দুই আয়াতে ইহুদীদের যেসকল অপরাধের কারণে তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে তন্মধ্যে একটি ছিল তাদের সুদ গ্রহণের অপরাধ। এটা তাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, তবু তারা সুদ গ্রহণ করত। তাই তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের কঠিন শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

عِندَ اللَّهِ ۖ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

মানুষের ধন-সম্পদে তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এই আশায় তোমরা সুদে যা কিছু দাও, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। পক্ষান্তরে, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় পবিত্র অন্তরে যারা দিয়ে থাকে, অতএব, তারাই দ্বিগুণ লাভ করে।[সূরা রুম,আয়াত ৩৯]

এরপর সুদের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসসমূহ উল্লেখ করা হচ্ছে :

এক. নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ... وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ...

তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বিরত থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সাতটি ধ্বংসাত্মক কাজ কী? তিনি বললেন-

১. আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন করা, ২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করা, যা আল্লাহ নিষেধ করেছেন। ৪. সুদ খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ৬. জিহাদের ময়দান থেকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়ে যাওয়া। ৭. সতী-সাধ্বী সরলমনা-উদাসীনা মুমিন নারীদের বিরুদ্ধে অপকর্মের মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। -সহীহ বুখারী, হাদীস ২৭৬৬, ৬৮৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৮৯; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৮৭৪; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৩৬৭১

দুই. হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি স্বপ্নের কথা বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে-

'আমি দেখলাম আজ রাতে আমার কাছে দু'জন মানুষ আসল এবং তারা আমাকে একটি পবিত্র ভূখ- নিয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে একটি রক্তের নদীর কিনারে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সেই নদীতে একজন পুরুষ দাঁড়িয়ে আছে। আর নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন পুরুষ। তার সামনে রয়েছে পাথর। যখন নদীর লোকটি কিনারে উঠতে চায় তখন কিনারে থাকা লোকটি তার মুখে পাথর নিক্ষেপ করে। পাথরের আঘাতে লোকটি যেখানে ছিল সেখানে ফিরে যায়। এরপর সে আবারও নদীর কিনারে উঠতে চায়, এভাবে সে যখনই কিনারে উঠতে চায় তখনই তাকে পাথর মেরে যেখানে ছিল সেখানে ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

আমি আমার সাথে থাকা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, রক্তের নদীতে অবস্থিত লোকটি, যার মুখের উপর পাথর মেরে আপন জায়গায় ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে লোকটি কে? তখন তাদের একজন আমাকে বললেন, এ লোকটি সুদখোর।' -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৩৮৬, ২০৮৫

তিন. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَه.ُ

যে ব্যক্তি সুদ খায় এবং যে সুদ খাওয়ায় উভয়কে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৫৯৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬; সুনানে নাসাঈ, হাদীস ৫১০৪

চার. হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে ৭টি গুনাহকে বড় গুনাহ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল সুদ খাওয়া। -মুসনাদে বাযযার; আল মু'জামুল কাবীর, তবারানী, হাদীস ১০২; আলমুজামুল আওসাত, তবারানী, হাদীস ৫৭০৯

পাঁচ. অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَكَاتِبَه.ُ

যে সুদ খায়, যে সুদ খাওয়ায়, যে সাক্ষী থাকে এবং যে ব্যক্তি সুদের হিসাব-নিকাশ বা সুদের চুক্তিপত্র ইত্যাদি লিখে দেয় সকলের প্রতি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লা'নত করেছেন। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ৬৬০; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ৩৩৩৩; জামে তিরমিযী, হাদীস ১২০৬

এ ছাড়াও আরও অসংখ্য হাদীসে সুদ খাওয়া, সুদ দেওয়া এবং সুদের সাথে কোনোরূপ সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে।

এই ভয়াবহতম হারাম কর্মটিকেই এখন বানিয়ে ফেলা হয়েছে অতি উপাদেয় একটি বিষয়। মতলববাজ লোকেরা সকল শ্রেণির মুসলমানদের এতে জড়ানোর জঘন্যতম কাজটি করে যাচ্ছে বিনা বাধায়।

সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা প্রবর্তনে ইসলামের পদ্ধতিসমূহ:

বাইয়ে মুদারাবা:

মুদারাবা(Mudarabah)অংশীদারিত্বের একটি বিশেষ পদ্ধতি। যে অংশীদারিত্বে এক-শরীক অপরকে ব্যবসায় বিনিয়োগের জন্য অর্থ সরবরাহ করে। পুঁজি বিনিয়োগ করে প্রথম পক্ষ, তাকে বলা হয়"রাব্বুলমাল" বা "পুঁজি বিনিয়োগকারী"। অপরদিকে ব্যবসার পরিচালনা এবং কাজের দায়িত্ব দ্বিতীয় পক্ষের উপর, যাকে বলা হয়,"মুদারিব" বা "কারবারি"।

মুদারাবা পদ্ধতিতে:

মুদারাবা এমন একটি অংশীদারি কারবার যেখানে এক পক্ষ পূর্ণ মূলধন সরবরাহ করে আর অন্য পক্ষ শ্রম, অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ব্যবসা পরিচালনা করে। মূলধনের মালিককে "সাহেবে মাল" এবং মূলধন ব্যবহারকারীকে "মুদারিব" বলে। উভয় পক্ষই একক বা একাধিক ব্যক্তি হতে পারে।

মুদারাবা প্রধানত দুই প্রকার:

১. মুদারাবা মুতলাক
২. মুদারাবা মুক্বাইয়াদা

মুদারাবা মুতলাক ও মুক্বাইয়াদা -এর পরিচিতি

১. মুদারাবা মুতলাক:

যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, সময়সীমা, শ্রেণি, অংশীদারগণের সংখ্যা, ব্যবসার প্রকৃতি পরিধি ইত্যাদি কিছুই নির্দিষ্ট থাকে না, তাকে 'মুদারাবা মুতলাক' বলা হয়। এ পদ্ধতিতে যে কোনো স্থানে, যে কোনো পণ্যের স্বাধীনভাবে ব্যবসা পরিচালনা করতে পারে।

২. মুদারাবা মুক্বাইয়াদা:

যে মুদারাবা চুক্তিতে ব্যবসার স্থান, ব্যবসার ধরন, সময়সীমা, অংশীদারগণের সংখ্যা, মালামাল ক্রয়ের বিবরণ, কোথায় বিক্রয় করবে ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়গুলো নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, তাকে 'মুদারাবা মুক্বাইয়াদা' বলে। এ পদ্ধতিতে উদ্যোক্তার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে না। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী সাহেবে মালের নির্দেশ মোতাবেক উদ্যোক্তাকে অবশ্যই ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে। এর ব্যতিক্রম হলে তা অবৈধ হবে।
এ পদ্ধতিতে ইসলামী ব্যাংক উদ্যোক্তাকে আর্থিক পুঁজি দিয়ে থাকে। ব্যবসার লাভ ব্যাংক ও উদ্যোক্তা পূর্ব নির্ধারিত পারস্পরিক সম্মতিক্রমে নির্ধারিত হয়। পরে তা উভয়ে ভাগ করে নেয়া হয়। ব্যবসায় যদি প্রকৃত লোকসান হয়, তবে পুঁজির মালিক হিসেবে ব্যাংককেই সমস্ত লোকসান বহন করতে হয়। এটিই ইসলামী শরীয়ার নির্দেশ।

মুদারাবা ব্যবসা:

রাব্বুলমাল মুদারিকে বিশেষ ধরনের ব্যবসা করা নির্দিষ্ট করে দিতে পারে। এ ক্ষেত্রে মুদারিবকে শুধুমাত্র রাব্বুলমালের নির্দেশ মোতাবেক ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে হবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুক্বাইয়াদা' বলা হয়। পক্ষান্তরে রাব্বুলমাল যদি মুদারিবকে যে কোনো ধরনের ব্যবসা করার স্বাধীনতা প্রদান করে, তাহলে মুদারিব ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করতে পারবে। এ ধরনের মুদারাবাকে 'মুদারাবা মুত্বলাকা' বলা হয়।

মুশারাকা:

একজন রাব্বুলমাল একই চুক্তিতে একাধিক ব্যক্তির সাথে মুদারাবার চুক্তি করতে পারে। অর্থাৎ, রাব্বুলমাল তার পুঁজি 'ক' এবং 'খ' উভয়কে (যৌথভাবে) প্রদান করতে পারে। সুতরাং তাদের প্রত্যেকেই রাব্বুলমালের জন্য মুদারিব হিসেবে কাজ করতে পারবে এবং মুদারাবার মূলধন উভয়ে যৌথভাবে ব্যবহার করবে, মুদারিবের অংশ তাদের উভয়ের মাঝে পূর্ব নির্ধারিত অনুপাতে বণ্টন করা হবে। এক্ষেত্রে উভয় মুদারিব পরস্পরের অংশীদারের ন্যায় ব্যবসার কাজ পরিচালনা করবে।

মুদারিব একজন হোক কিংবা একাধিক হোক, তারা ব্যবসায় ঐ সকল কাজ করতে পারবে, যা সাধারণত এ ধরনের ব্যবসায় করা হয়ে থাকে। কিন্তু মদারিব যদি এমন কোনো অসাধারণ কাজ করতে চায়, যা ব্যবসায়ীগণ সাধারণত করে না, তাহলে তা রাব্বুলমালের সুস্পষ্ট অনুমতি ব্যতীত করতে পারবে না।

মুনাফা বণ্টন:

মুদারাবা বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য অন্যতম জরুরি শর্ত হল, কারবার শুরু করার পূর্বেই উভয়পক্ষ প্রকৃত লভ্যাংশ বণ্টনের হার নির্ধারণের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে, সে অনুযায়ী রাব্বুলমাল এবং মুদারিব উভয়ে লভ্যাংশের পাওনাদার হবে। শরীয়ত লভ্যাংশ বন্টনের নির্দিষ্ট কোনো অনুপাত বর্ণনা করেনি, বরং তা নির্ধারণের ব্যাপারে উভয়পক্ষের স্বাধীন মতামতের উপর ছেড়ে দিয়েছে। তারা লভ্যাংশে সমহারেও অংশীদার হতে পারে কিংবা রাব্বুলমাল এবং মুদারিবের জন্য পৃথক পৃথক অনুপাতও নিদিষ্ট করতে পারে। তবে, তারা কোনো পক্ষের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ লাভ ধার্য করতে পারবে না। এমনিভাবে কোনো পক্ষের মুনাফা মূলধনের কোনো আনুপাতিক অংশের সাথেও নির্দিষ্ট করতে পারবে না।
উদাহরণস্বরূপ: মূলধন যদি এক লাখ টাকা হয়, তাহলে তারা এ শর্তে চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না যে, সমুদয় মুনাফার দশ হাজার টাকা মুদারিব পাবে। এবং এ ধরনের চুক্তিও করতে পারবে না যে, (যেমন) মূলধনের ২০% রাব্বুলমালকে দেয়া হবে। তবে এ চুক্তি করতে

পারবে যে, প্রকৃত মুনাফার ৪০% মুদারিব পাবে এবং ৬০% রাব্বুলমাল পাবে, কিংবা ৬০% মুদারিব এবং ৪০% রাব্বুলমাল পাবে।

বিভিন্ন অবস্থায় মুনাফার বিভিন্ন অনুপাত ধার্য করাও জায়েয আছে।

যেমন রাব্বুলমাল মুদারিবকে একথা বলতে পারে যে, তুমি যদি গমের ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৫০% পাবে, আর যদি আটার ব্যবসা কর, তাহলে সমুদয় মুনাফার ৩৩% পাবে। এমনিভাবে রাব্বুলমাল একথাও বলতে পারে যে, তুমি যদি নিজ শহরে ব্যবসা কর, তাহলে ৩০% পাবে, আর যদি ভিন্ন শহরে ব্যবসা কর, তাহলে মুনাফায় তোমার অংশ ৫০% হবে। মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক অংশ ব্যতীত মুদারিব মুদারাবার জন্য কৃত স্বীয় কাজের বিনিময়ে কোনো রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবি করতে পারবে না।

ফিকহবিদদের সর্বসম্মতিক্রমে মুদারিব পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে মুনাফা ব্যতীত মুদারাবার ব্যবসা পরিচালনার কারণে কোনো রকম বেতন, ভাতা বা বিনিময়ের দাবি করতে পারবে না। তবে ইমাম আহমাদ রহ. মুদারিবকে মুদারাবা একাউন্ট থেকে শুধুমাত্র দৈনিক খোরাকের খরচ গ্রহণ করার অনুমতি প্রদান করেন। কিন্তু হানাফী ফিকহবিদদের নিকট মুদারিব মুদারাবা একাউন্ট থেকে দৈনিক খোরাকের খরচ ঐ সময় গ্রহণ করতে পারবে, যখন সে মুদারাবা ব্যবসার জন্য নিজ শহরের বাইরে ভ্রমণ করবে। তখন সে তার থাকা খাওয়া ইত্যাদি খরচ গ্রহণ করতে পারবে। নিজ শহরে থাকাকালীন সময়ে দৈনিক কোনো খরচের পাওনাদার হবে না।

যদি মুদারাবার কোনো ব্যবসায় লোকসান হয় এবং কোনো ব্যবসায় লাভ হয়, তাহলে প্রথমে লাভ দ্বারা লোকসানের ক্ষতিপূরণ করা হবে। ক্ষতিপূরণের পর যা থাকবে, তা উভয়ের মাঝে পূর্ব সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে।

মুদারাবা সমাপ্ত করা:

মুদারাবা চুক্তি উভয়পক্ষের যে কেউ যে কোনো সময় অপর পক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে সমাপ্ত করতে পারে। সমাপ্তির সময় মুদারাবার সমুদয় সম্পদ যদি তরল আকৃতির হয় এবং মূলধনের বিনিময়ে কিছু মুনাফাও অর্জিত হয়, তাহলে তা উভয়ের মাঝে মুনাফার সিদ্ধান্তকৃত আনুপাতিক হারে বণ্টন করা হবে। কিন্তু মুদারাবার সম্পদ যদি তরল আকৃতির না হয়, তাহলে মুদারিবকে মুদারাবার সম্পদ বিক্রয় করে তারল্যে রূপান্তরিত করার সুযোগ দেয়া হবে, যাতে প্রকৃত মুনাফা নির্ধারণ করা যায়।

মুসলিম ফিকহবিদদের এ প্রশ্নের ব্যাপারে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যে, মুদারাবাকে এমন কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে নির্ধারণ করা যাবে কি-না, যে মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে মুদারাবা চুক্তি নিজে নিজেই সমাপ্ত হয়ে যাবে। হানাফী এবং হাম্বলী মাযহাব অনুযায়ী

মুদারাবাকে সুনির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে। যেমন এক বছর, ছয় মাস ইত্যাদি। যার পরে মুদারাবা বিনা নোটিশে সমাপ্ত হয়ে যাবে। অপরদিকে মালেকী এবং শাফেয়ী ফিহবিদদের দৃষ্টিভঙ্গি হল মুদারাবাকে নির্দিষ্ট মেয়াদের সাথে সীমাবদ্ধ করা যাবে না।

তবে ফিকহবিদদের এ মতবিরোধ মুদারাবার মেয়াদের সর্বশেষ এবং সর্বোচ্চ সময়সীমার সাথে সম্পৃক্ত। কিন্তু উভয়ের পক্ষ থেকে মুদারাবার এমন কোনো সর্বনিম্ন সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে কিনা, যার পূর্বে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করা যাবে না?
ইসলামী ফিকহের গ্রন্থাবলিতে এ প্রশ্নের ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। কিন্তু একটি মূলনীতি যা এক্ষেত্রে উল্লেখ করা হয়, এর দ্বারা বুঝা যায় যে, এ ধরনের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ করা যাবে না; বরং উভয়পক্ষের যে কেউ যখন ইচ্ছা করবে মুদারাবা চুক্তি সমাপ্ত করতে পারবে।
উভয়পক্ষের মুদারাবা সমাপ্তি করার এই অসীম স্বাধীনতা বর্তমান যুগে কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। কেননা, বর্তমানে অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে সফলতা দেখানোর জন্য বেশ কিছু সমায়, দৃঢ়সংকল্প ও স্থিরচিত্তসম্পন্ন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। এ কারণে রাব্বুলমাল যদি ব্যবসার একেবারেই শুরুর-লগ্নে মুদারাবা সমাপ্ত করে দেয়, তাহলে তা এই প্রকল্পের জন্য বিরাট জটিলতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। বিশেষ করে মুদারিবের জন্য মারাত্মক ক্ষতি হবে, কেননা সে সার্বিক প্রচেষ্টা ব্যয় করার পরও কোনো কিছু অর্জন করতে পারেনি। এজন্য মুদারাবা চুক্তির প্রারম্ভেই যদি উভয়পক্ষ এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হয় যে, কোনো পক্ষ একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যা বিশেষ কোনো সমস্যা ব্যতীত মুদারাবাকে সমাপ্ত করবে না, তাহলে এ শর্তটি বাহ্যিক বৃষ্টিতে শরীয়তের কোনো মূলনীতির পরিপন্থি বলে মনে হয় না।

মুশারাকা (Musharakah):

এটি যৌথ বিনিয়োগ চুক্তি, যেখানে উভয় পক্ষ মূলধন ও ঝুঁকি বহন করে এবং লাভ-ক্ষতি একটি চুক্তিপত্র অনুযায়ী ভাগ করে নেয়। এটি সমানাধিকার ভিত্তিক অংশীদারিত্ব গঠন করে।

মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বয়:
সাধারণ অবস্থায় এটাই মনে করা হয় যে, মুদারিব মুদারাবায় কোনো পুঁজি বিনিয়োগ করে না, সে শুধু ব্যবস্থাপনার যিম্মাদার, সমুদয় পুঁজি রাব্বুলমাল বিনিয়োগ করে। কিন্তু এমন অবস্থাও হতে পারে যে, মুদারিবও তার কিছু পুঁজি মুদারাবা ব্যবসায় বিনিয়োগ করতে চায়, এ ক্ষেত্রে মুশারাকা এবং মুদারাবা চুক্তিদ্বয় একত্রিত হয়ে যাবে। উদাহরণস্বরূপ- 'A', 'B' কে মুদারাবার ভিত্তিতে এক লাখ টাকা প্রদান করল। অতঃপর 'B', 'A' এর সম্পতিতে নিজের পক্ষ থেকে আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা মুদারাবায় সংযুক্ত করল। এ জাতীয় অংশীদারিত্বের

সাথে মুশারাকা এবং মুদারাবার সমন্বিত মু'আমালা করা হবে। এখানে মুদারিব নিজের জন্য অংশীদার হিসেবে মুনাফার বিশেষ একটি অংশ ধার্য করতে পারবে। এর সাথে সাথে সে মুদারিব হিসেবে মুদারাবার ব্যবস্থাপনা এবং পরিশ্রমের কারণে মুনাফার আরেকটি অংশ ধার্য করতে পারবে। উল্লিখিত উদাহরণে মুনাফা এ ভিত্তিতে নির্ধারণ হবে যে, 'B' প্রকৃত মুনাফার এক-তৃতীয়াংশ স্বীয় পুঁজির কারণে পাবে, অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ মুনাফা উভয়ের মাঝে সমহারে বণ্টন হবে, কিন্তু (এই দুই-তৃতীয়াংশ বণ্টনে) উভয়পক্ষ অন্য কোনো আনুপাতিক হারের উপরও চুক্তিবদ্ধ হতে পারে। তবে এতটুকু শর্ত যে, নিষ্ক্রিয় অংশীদার (Sleeping Partner) স্বীয় পুঁজির অনুপাত অপেক্ষা বেশি গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং উল্লিখিত উদাহরণে, 'A' নিজের জন্য সমুদয় মুনাফার দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ধার্য করতে পারবে না। কেননা, তার বিনিয়োগকৃত পুঁজি সমুদয় পুঁজির দুই তৃতীয়াংশের অধিক নয়।

বাইয়ে সালাম:

বাইয়ে সালাম হচ্ছে এমন একটি চুক্তি যেখানে ক্রেতা কোনো পণ্যের মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করে এবং বিক্রেতা পরবর্তীতে সেই পণ্য সরবরাহ করতে সম্মত হন।

উদাহরণস্বরূপ, ক্রেতা যদি ১হাজার টাকা নগদ দেয় এবং বিক্রেতা ৪-৫ মাস পর ক্রেতাকে ২ মণ ধান দিতে রাজি হন, তবে এটি বাইয়ে সালাম হিসেবে গণ্য হবে।

আরবিতে সালাম শব্দের অর্থ হস্তান্তর করা।
যেহেতু এ ধরনের বেচাকেনা টাকা অগ্রিম হস্তান্তর করা হয় আর পন্য পরবর্তী সময় গ্রহণ করা হয়,তাই এই বেচাকেনাকে বায়ে সালাম বলে। বাইয়ে সালামকে বাইয়ে সলফও বলা হয়।

বাইয়ে সালামের প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়েছে,তা নিশ্চিতরুপে বলা না গেলেও বিশুদ্ধ হাদিস ও ঐতিহাসিক বর্ণনা অনুযায়ী রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর সময়কালে খেজুর ও ফসলে বায়ে সালামের ব্যাপক প্রচলন ছিল।

মদিনার স্বল্প পুঁজির ব্যবসায়ীরা অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করে, কম দামে পণ্য কিনতেন আর বিক্রেতারাও চাষাবাদ খরচ বহন করার জন্য অগ্রিম মূল্য নিতে তথা বাইয়ে সালাম করতে আগ্রহী ছিল।

ইসলামী শরিয়তে, বেচাকেনাতে সামান্য ধরনের অস্পষ্টতার কারণেও যেখানে বেচাকেনাকে বাতিল ঘোষণা করা হয়েছে, সেখানে বাইয়ে সালামকে পণ্য সম্পূর্ণ অনুপস্থিত থাকা সত্ত্বেও শুধু গুণাগুণ জানা থাকার শর্তে এটিকে হালাল সাব্যস্ত করা হয়েছে। এটি করা হয়েছে মানুষের কল্যাণ ও সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে। কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে এর বৈধতার প্রমাণ রয়েছে।

কুরআনে বলা হয়েছে:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ
"হে মুমিনরা! তোমরা যখন একে অন্যের সঙ্গে নির্ধারিত সময়ের জন্য ঋণের আদান-প্রদান করো, তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখ।
[সূরা বাকারা; ২৮২০]

হাদিসে বর্ণিত আছে, ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "আমি দৃঢ়তার সাঙ্গে বলছি, বাইয়ে সালাম সম্পর্কে কুরআনে এক নাতিদীর্ঘ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।" এরপর তিনি উপরিউক্ত আয়াতটি তেলাওয়াত করেন।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন মদিনায় পদার্পণ করেন, তখন মদিনাবাসী এক, দুই ও তিন বছর মেয়াদে বিভিন্ন ধরনের ফল অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করত। তা দেখে তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করবে, সে যেন নির্ধারিত পরিমাপ, নির্ধারিত ওজন এবং নির্ধারিত মেয়াদের জন্য করে।" [বুখারী, মুসলিম ও আবু দাউদ]

আবদুল্লাহ ইবনে আবু আউফা (রা.) বলেছেন, "আমরা নবী (সা.)-এর যুগে, আবু বকর (রা.)-এর যুগে ও ওমর (রা.)-এর যুগে বাইয়ে সালাম (অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়) করতাম।" ইজমার আলোকেও বাইয়ে সালাম বৈধ। কারণ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী প্রায় সকল ফকিহ এই বিষয়ে একমত যে বাইয়ে সালাম হালাল।

আল্লামা ইবনে কুদামা (রহ.) বলেন, "এতে একদিকে বিক্রেতা অগ্রিম মূল্য দ্বারা নিজের পরিবার ও উৎপাদনের খরচ বহন করতে সক্ষম হয়, অন্যদিকে ক্রেতাও এর মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম মূল্যে পণ্য সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং এই উপকারী ব্যবসা অবশ্যই হালাল হিসেবে বিবেচিত হবে।" হাদিস ও ফিকহের নির্ভরযোগ্য কিতাবগুলোতে বাইয়ে

সালামের বৈধতার বিষয়ে ইজমার উল্লেখ রয়েছে। বাইয়ে সালাম একটি লেনদেন প্রক্রিয়া হলেও, সাধারণ বেচাকেনার মতো নয়। কারণ এতে পণ্য পরবর্তীতে পরিশোধ করার কারণে পণ্যের গুণাগুণ নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে, যা সাধারণ বেচাকেনাতে নেই।
বাইয়ে সালাম চুক্তিতে পণ্যের নির্দিষ্টকরণ এবং সরবরাহের তারিখ নির্ধারণ করতে হয়।

তাই বাইয়ে সালাম এমন পণ্যসামগ্রীতে বৈধ যেগুলোর পরিমাণ, বৈশিষ্ট্য, অবস্থা, প্রকৃতি ও ধরণ নির্ধারণ করা সম্ভব।
যেমন:
ওজনযোগ্য দ্রব্য: যেমন - চাল, ডাল, লবণ, চিনি, রড, সিমেন্ট, ইত্যাদি।
পরিমাপযোগ্য দ্রব্য: যেমন - তেল, পানি, গ্যাস, দুধ, মধু ইত্যাদি।
গণনাযোগ্য দ্রব্য: যেমন - কলা, কমলা, ডিম, লিচু ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, গণনাযোগ্য দ্রব্যের পরিমাণ ও গুণগত মানের উল্লেখ হওয়া জরুরি। উল্লেখিত মান ও পরিমাণের মধ্যে অধিক ব্যবধান থাকলে, বাইয়ে সালাম বৈধ হবে না।

গজ, ফুট বা মিটার দ্বারা পরিমিত দ্রব্য: যেমন - কাপড়, তার, চট, কার্পেট, জমি, প্লট, ফ্ল্যাট ইত্যাদি।
ওজনযোগ্য, পরিমাপযোগ্য ও গণনাযোগ্য দ্রব্যের শর্ত এজন্য করা হয়েছে, যাতে পণ্যের সুস্পষ্ট পরিচয় ক্রেতার কাছে দেওয়া যায়।

বাইয়ের সালামের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তগুলো বিশেষভাবে লক্ষণীয়: ৩টি
১. পণ্য ও মূল্য সুনির্দিষ্ট করা। অর্থাৎ ধান বেচাকেনার ক্ষেত্রে ধানের প্রকার, গুণগত মান এবং পরিমাণ সুনির্ধারিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী মূল্যও চূড়ান্ত হওয়া।

২. পণ্য মূল্য চুক্তির সময়ই হস্তগত করা এবং পণ্য প্রদানের তারিখ ও স্থান নির্ধারিত করে নেওয়া।

৩. কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেতের ধান দেওয়ার শর্ত না করা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য, নির্দিষ্ট ক্ষেতের ধান বা নির্দিষ্ট বাগানের ফল দেওয়ার শর্ত করলে, বাইয়ে সালাম চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হয়।
বরং বিষয়টিকে আম বা সাধারণ রাখতে হবে, যাতে যেকোনো ক্ষেতের ধান যেকোনো বাগানের ফল দেওয়া-নেওয়ার সুযোগ থাকে।

আরেকটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, বাইয়ে সালামে অগ্রিম মূল্য পরিশোধ করার কারণে সাধারণ মার্কেট মূল্যের চেয়ে খুব বেশি তারতম্য হওয়া উচিত নয়। কারণ এতে তা গুবনে ফাহেশ (চরম লোকসান) হয়ে যাবে, যা নিষিদ্ধ।

কর্জে হাসানা

করজ(قرض)অর্থ ঋণ, ধার বা কর্জ; আর হাসানা(حسن) অর্থ উত্তম। উভয়ে মিলে কর্জে হাসানা অর্থ উত্তম ঋণ।করজে হাসানা' মানব জীবন ব্যবস্থার এক বিশেষ অর্থনৈতিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা। করজে হাসানার অর্থ হচ্ছে ঋণ বা করজ দেয়া যা সময়মতো পরিশোধ করা হবে। কিন্তু দাতা কোনো অতিরিক্ত অর্থ বেনিফিট নিতে পারবেন না। এর উদ্দেশ্য হলো, সমাজের ঋণগ্রস্ত মানুষের একটি প্রয়োজন পূর্ণ করা। ইসালামী পরিভাষায় : আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের আশায় সওয়াবের নিয়তে বিনা শর্তে কাউকে কোনো কিছু ঋণ দিলে তাকে কর্জে হাসানা বা উত্তম ঋণ বলে। ইসলামী আর্থসামাজিক ব্যবস্থায় কর্জে হাসানার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অপরিসীম।

কর্জে হাসানার সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ:

১. টাকার ক্ষেত্রে কর্জ গ্রহীতাকে শুধু কর্জের সমপরিমাণ টাকা বা সম্পদ সময়মত পরিশোধ করতে হবে। কোনো বস্তু বা ফসল দিয়ে কর্জ দেয়া হলে, সমপরিমাণ ও সম-মানের বস্তু বা ফসল ফেরত দিতে হবে।

২. কর্জ গ্রহীতার উপর আলাদা করে ঋণের অতিরিক্ত কোনো কিছু প্রদান করার কোনো প্রকার শর্ত দেয়া যাবে না।

ক. বস্তু বা ফসল দিয়ে কর্জ দেয়া হলে, সমপরিমাণ কিন্তু উন্নত মানের বস্তু বা উন্নত মানের ফসল ফেরত দেয়ার শর্ত দেয়া যাবে না। সমপরিমাণ ও সমমানের বস্তু বা ফসলই ফেরত নিতে হবে।

খ. এমনকি কর্জের বিপরীতে প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবেও কোনো প্রকার উপকার নেয়া যাবে না।

৩. কর্জে হাসানা গ্রহীতা যখন যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে কর্জের অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার করতে পারবেন।

৪. যে ব্যক্তি কর্জে হাসানা নিল, সে সকল ঝুঁকি বহন করবে। দাতা কোনো ঝুঁকি বহন করবে না।

ক. ঋণ দেয়া অর্থ ও সম্পদ হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেলেও পুরো অর্থ ও সম্পদ ফেরত দিতে হবে।

খ. কর্জ-দাতা যেমন কর্জ দেয়া অর্থ ও সম্পদ কাজে লাগানোর ফলে বা ব্যবসা করার পর পাওয়া লাভের কোনো অংশ পাবেন না, তেমনি ক্ষতিরও কোনো অংশ বহন করবেন না।

৫. কর্জ-গ্রহীতা নিজের পক্ষ থেকে মূল কর্জের বেশি বা অতিরিক্ত পরিমাণ ফেরত দিতে পারবেন। এটা শর্তসাপেক্ষে সম্পূর্ণ জায়েজ এবং উত্তম। শর্তগুলো হলো:

ক. এই অতিরিক্ত দেয়ার কোনো রকম পূর্বশর্ত না থাকা।

খ. সমাজের সবাই দেয়, তাই ধরেই নেয়া যে কর্জ-গ্রহীতা অতিরিক্ত ফেরত দিবে, এমনটা না ঘটা। অর্থাৎ, এরকম কর্জের মূল অঙ্কের বাইরে অতিরিক্ত প্রদানের ব্যাপারে সমাজের রীতি প্রসিদ্ধ না থাকাটা জরুরি।

গ. এই অতিরিক্ত করে ফেরত দেয়ার ব্যাপারে আগে থেকেই কোনো প্রকার প্রত্যক্ষ বা প্রচ্ছন্ন সমাঝোতা না থাকা।

৬. কর্জে হাসানার গ্রহীতা কর্জ ফেরতে অপারগ হলে,

ক. কর্জ-দাতা সেই কর্জ মাফ করে দিতে পারবেন

খ. কর্জ-দাতা জাকাত হিসেবে গ্রহীতাকে টাকা বা সম্পদটা দিয়ে দিতে পারবেন যদি তিনি জাকাত গ্রহণের যোগ্য হন। তবে, আপনি যদি মুখে মুখে বলেন দেন কর্জ নেয়া ব্যক্তিকে যে, 'ভাই, তোমার টাকাটা ফেরত দেয়া লাগবে না, এটা আমি তোমাকে জাকাত হিসেবে দিয়ে দিলাম।' তাহলে আপনার জাকাত আদায় হবে না। তাহলে কি পন্থা অবলম্বন করবেন? এক্ষেত্রে কর্জদাতা ব্যক্তি কর্জের সমপরিমাণ সম্পদ/অর্থ গ্রহীতাকে জাকাত হিসেবে দিবে। গ্রহীতা এই অর্থ/সম্পদ বুঝে পাওয়ার পর দাতা তা পুনরায় নিয়ে নিবেন ঋণ পরিশোধ হিসেবে। এভাবে করলে জাকাত আদায় হবে। নতুবা জাকাত আদায় হবে না।

গ. অন্য যে-কোনো ব্যক্তি তার সদকা/জাকাত দিয়ে কর্জ-গ্রহীতার ঋণ আদায় করে দিতে পারবেন।

এই ক্ষেত্রেও শরঈ নির্দেশনা অনুসারে প্রথমে যার কর্জ মেটানো হচ্ছে, সেই কর্জ-গ্রহীতাকে জাকাতের টাকাটা দিতে হবে এবং এরপর সে এই জাকাতের টাকাটা কর্জ পরিশোধ হিসেবে ব্যক্তিকে বা প্রতিষ্ঠানকে ফেরত দিবে।

৭. কর্জ-গ্রহীতা সময়মত কর্জ পরিশোধ করতে না পারলে,

ক. কর্জ-দাতা কর্জ ফেরতের সময় বাড়িয়ে দিতে পারেন। কিন্তু অতিরিক্ত সময়ের জন্য কোনোরূপ অতিরিক্ত অর্থ বা সম্পদ কোনভাবেই আদায় করা যাবে না।

খ. সময়মত কর্জ পরিশোধ করতে না পারলে, দাতা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর সালিশ বা আইনী ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৮. কর্জ-গ্রহীতা জাকাত হিসাবের সময় ঋণ নেয়া অংশ বাদ দিয়ে হিসাব করবে।

৯. কর্জ দাতা যে অর্থ ও সম্পদ ঋণ দিয়েছেন সেটার জাকাত তিনি আদায় করবেন।

ইসলামের দৃষ্টিতে কর্জে হাসানার গুরুত্ব :

আর্থিক ইবাদাতের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদাত হলো 'কর্জে হাসানা'। মহান আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুরআনে মানুষকে কর্জে হাসানা প্রদানের পুরস্কার ঘোষণা করে বলেছেন

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيم

"দানশীল পুরুষরা আর দানশীলা নারীরা আর যারা আল্লাহকে কর্জে হাসানা দেয়, তাদের জন্য বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে, আর তাদের জন্য আছে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান।"
-সুরা হাদিদ, আয়াত ১৮

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيم.يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِم بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে কর্জে হাসানা দিবে? তাহলে তিনি তা তার জন্য কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিবেন আর তার জন্য আছে সম্মানজনক প্রতিফল। সে দিন তুমি মুমিন ও মুমিনাদের দেখবে, তাদের সামনে আর তাদের ডানে তাদের জ্যোতি ছুটতে থাকবে। (তাদেরকে বলা হবে) 'আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ যার নিচ দিয়ে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে (তোমরা) চিরকাল থাকবে'। এটাই হলো বিরাট সফলতা।"
-সুরা হাদিদ, আয়াত **১১-১২**

কর্জে হাসানা দিতে গিয়ে কেউ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তার দুঃখ পাওয়ার কোনো কারণ নেই, কেননা এর বিনিময়ে আল্লাহর নিকট উত্তম প্রতিদান জমা আছে। এই ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

"এমন কে আছে যে, আল্লাহকে করজ দেবে, উত্তম করজ; অতঃপর আল্লাহ তাকে দ্বিগুণ-বহুগুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। আল্লাহই সংকোচিত করেন এবং তিনিই প্রশস্ততা দান করেন এবং তাঁরই নিকট তোমরা সবাই ফিরে যাবে।"
-সুরা বাকারা, আয়াত ২৪৫

আল্লাহ সুবহানাহু তায়া'লা আমাদের পূর্ববর্তী জাতিদেরকেও কর্জে হাসানা দানের নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং সেই কর্জে হাসানার প্রতিদানও ছিল অত্যন্ত উচ্চ। আল্লাহ বলেন,

وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا ۖ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ ۖ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

"আল্লাহ বনী-ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন এবং আমি তাদের মধ্য থেকে বার জন সর্দার নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলে দিলেনঃ আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দিতে থাক, আমার পয়গম্বরদের প্রতি বিশ্বাস রাখ,

তাঁদের সাহায্য কর এবং আল্লাহকে উত্তম পন্থায় ঋন দিতে থাক, তবে আমি অবশ্যই তোমাদের গোনাহ দুর করে দিব এবং অবশ্যই তোমাদেরকে উদ্যান সমূহে প্রবিষ্ট করব, যেগুলোর তলদেশ দিয়ে নিঝরিনীসমূহ প্রবাহিত হয়। অতঃপর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি এরপরও কাফের হয়, সে নিশ্চিতই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ে।"
-সুরা মায়িদা, আয়াত ১২

"...কাজেই তোমাদের জন্য যতটুকু সহজসাধ্য হয় তাই তাথেকে পাঠ কর, আর নামাজ প্রতিষ্ঠা কর, জাকাত দাও আর আল্লাহকে কর্জ দাও কর্জে হাসানা। তোমরা যা কিছু কল্যাণ নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট (সঞ্চিত) পাবে, তাই উত্তম এবং পুরস্কার হিসেবে খুব বড়। তোমরা আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু।"
সুরা মুজ্জাম্মিল, আয়াত ২০

উপরিউক্ত আয়াতসমূহ থেকে আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করতে পারি, আল্লাহর দরবারে কর্জে হাসানার গুরুত্ব কত বেশি।

এমন কে আছে যে, আল্লাহকে উত্তম করয দিবে ? তাহলে তিনি তার জন্য তা বহুগুণে বৃদ্ধি করে দিবেন এবং তার জন্য রয়েছে সম্মানজনক প্রতিদান। [সূরা-হাদিদ, আয়াত-১১।] إِن تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيم অর্থ যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তিনি তা তোমাদের জন্য দ্বিগুন করে দিবেন এবং তোমাদের ক্ষমা করে দিবেন। আল্লাহ গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল। [সূরা- তাগাবুন, আয়াত -১৭।]
وَأَقِيمُوا الصَّلَٰوةَ وَءَاتُوا الزَّكَٰوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيم অর্থ – আর সালাত কায়েম কর, যাকাত দাও এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও। আর তোমরা নিজদের জন্য মঙ্গলজনক যা কিছু অগ্রে পাঠাবে তোমরা তা আল্লাহর কাছে পাবে প্রতিদান হিসেবে উৎকৃষ্টতর ও মহত্তর রূপে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আল-মুজ্জাম্মিল,আয়াত-২০।]

বর্ণিত আয়াতগুলোর মর্মার্থ হলো-যিনি নামাজ পড়েন, যাকাত দেন, কর্জে হাসানা দেন এবং আল্লাহ পাকের কাছে কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চান- তাহলে তাকে আল্লাজ কর্জে হাসানার সওয়াব বহুগণে দেবেন, সম্মানজনক পুরুস্কার দিবেন এবং ক্ষমা করে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নহর প্রবাহিত।এ কারণেই হাদিস শরিফেও কর্জে হাসানা প্রদানে বান্দাকে যথেষ্ট অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

কর্জে হাসানা সম্পর্কে হাদিস :

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা.) ফরমায়েছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيه،ِ

অর্থ আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়ার বিপদ সমূহ থেকে একটি বিপদ দূরভীত করবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসের বিপদ সমূহ থেকে তার একটি বিপদ দূরভীত করবেন।

কেননা এর মাধ্যমে মানুষ অফুরন্ত সওয়াব ও কল্যাণে ভাগিদার হতে পারে।

হাদিসের একাধিক বর্ণনায় প্রমাণিত

-عَنْ قَيْسِ بْنِ رُومِيٍّ، قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أُذُنَانٍ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ . قَالَ مَا سَمِعْتَ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلاَّ كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً " . قَالَ كَذَلِكَ أَنْبَأَنِي ابْنُ مَسْعُود ٍ. অর্থ কায়স বিন রূমী (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ: আলকামা (রাঃ) বলেন, তুমি আমার নিকট কী হাদীস শুনেছ? তিনি বলেন আমি আপনাকে বিন মাসঊদ (রাঃ) -র সুত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দুবার করয দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়।আলকামাহ (রাঃ) বলেন, ইবনু মাসঊদ (রাঃ) আমাকে এভাবেই অবহিত করেছেন। [সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৪৩০]

ইবনে সীরীন রাহ. থেকে বর্ণিত, এক লোক একজনকে পাঁচ শ দিরহাম ঋণ দিয়েছে এবং তার ঘোড়ায় চড়ার শর্তারোপ করেছে। একথা শুনে ইবনে মাসউদ রা. বলেন, সে তার ঘোড়ায় চড়ে যে উপকৃত হয়েছে তা রিবা হিসেবে গণ্য হবে।–মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীস ২১০৮০

এ ধরনের ফতোয়া আরো অনেক সাহাবী–তাবেয়ী থেকে বর্ণিত আছে, যা থেকে স্পষ্ট যে, সুদের ধরন ও সুদের হারের কম–বেশির কোনো ফারাক নেই। বরং ভোগ্য সুদ ও ব্যবসায়ী সুদ, কমহারের সুদ ও বেশিহারের সুদ ইত্যাদি সবই রিবা। রিবার নিষেধাজ্ঞা ও এর ভয়াবহতা সব পদ্ধতিতেই বিদ্যমান রয়েছে। তবে হাঁ, সুদের পরিমাণ যত বেশি হবে,

গোনাহের ভয়াবহতা তত তীব্র হতে থাকবে এবং ভোগ্য ঋণের ক্ষেত্রে এই হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া অধিক অপরাধ ও অধিক হীনতা বিবেচিত হবে। আর সুদ আদায়ের জন্য শারীরিক বা আর্থিক কিংবা অন্য কোনো ধরনের জরিমানা আরোপ তো জুলুমের উপর জুলুম।

কর্জে হাসানার অর্থনৈতিক তাৎপর্য:

কর্জে হাসানা একটা চিন্তা বা নীতি যা বারবার অনুশীলন করার মতো একটা ব্যাপার। যারা এই চিন্তার বাইরে তাদের জন্য এর গুরুত্ব এবং তাৎপর্য বোঝা কঠিন। আর কর্জে হাসানা যে কেবল মুসলিমদের জন্য উপকারী ব্যাপারটি
এমন নয়। একটি সেকুলার রাষ্ট্র ব্যবস্থাও কর্জে হাসানার দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। তার একটি চমৎকার উদাহরণও ২০২০ সালের বিশ্ব মন্দায় উপস্থাপিত হয়েছে। করোনা মহামারির সময় যখন সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যায় সেই অবস্থায় ঋণ+সুদ কিস্তিতে ফেরত চাইলে অর্থনীতির উপর যে বিরূপ প্রভাব পড়বে তা সকলের অনুমেয়। এইটা বুঝেই সেই বছর পশ্চিমা বিশ্বের সরকাররা আইন করে ঋণের উপর সুদ বন্ধ করে দেয় মহামারি চলাকালীন সময়ের জন্য। তার মানে হলো যে, বিপদের সময়ে তারা সুদ স্থগিত রেখে কর্জে হাসানার কাছাকাছি একটা সমাধানকেই তাদের জন্য উপকারী হিসেবে বিবেচনা করেছে। সুতরাং, এটা বোঝা যায় যে, কর্জে হাসানার পুরোপুরি বাস্তবায়ন দীর্ঘ মেয়াদে মানবসমাজের জন্য আরো অনেক উপকারী হতো।এই ধারণাটি নতুন মনে হতে পারে। কিন্তু এটি মোটেও নতুন কোনো ধারণা নয় বরং হাজার বছর পুরানো একটি ধারণা যার নাম 'কর্জে হাসানা'। মহামারির কল্যাণে পৃথিবী কর্জে হাসানার কাছাকাছি ধরনের ঋণ লেনদেনের বড় পর্যায়ে প্রয়োগ দেখতে পেরেছে এবং বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছে। পরিসংখ্যান মতে ২০২০ সালে উন্নত বিশ্বে দেউলিয়া হওয়ার হার ছিল বর্তমান সময়ের সর্বনিম্ন। যেখানে অন্য সকল দিক থেকেই বছরটি ছিল সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। সেখানে শুধু আমেরিকাতেই দেউলিয়ার আবেদন কমেছে ৩০%।" সবসময় কর্জে হাসানা উপস্থিত থাকলে আমরা কতটা উপকার পেতে পারতাম!

ব্যাংকিং সেক্টরের অন্যতম জনপ্রিয় একটি আবিষ্কার ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে একজন গ্রাহক ৪৫ দিন পর্যন্ত বিনা সুদে ঋণ নিতে পারে। কিন্তু আপনি কি কখনও ভেবে দেখেছেন এই জনপ্রিয় আবিষ্কার ক্রেডিট কার্ড আসলে কী? এটি হচ্ছে ৪৫ দিন মেয়াদী কর্জে হাসানার "মতোই" একটি ব্যবস্থা

খরচ বহুগুণকরণ (ইংরেজিতে এক্সপেন্ডিচার মাল্টিপ্লায়ার ইফেক্ট)। অর্থনীতিবিদেরা অঙ্ক কষে দেখিয়েছেন যে, কোনো সরকার/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি যদি ১ টাকা খরচ করে, তাহলে সেটা প্রায় ১০ গুণ সমৃদ্ধি নিয়ে আসে। বিষয়টি এমন- আপনি বাড়ি তৈরি করতে এক গাড়ি সিমেন্ট কিনলে বাজারে যেই ব্যক্তি সিমেন্ট বিক্রি করেন তার হাতে টাকা আসলো, তার থেকে এই টাকা সিমেন্টের পাইকারি বিক্রেতা, তারপরে সিমেন্ট কারখানার মালিক শ্রমিক, কাঁচামাল সরবরাহকারী সবার হাতে হাতে ছড়িয়ে গেল। তারা যখন বাজার সদাই করবে তখন তাদের হাত থেকে টাকাটা অন্যান্য ব্যবসায়ীদের কাছে যাবে। এভাবে অল্প কিছু টাকার ব্যয় অনেক বেশি কল্যাণ বয়ে আনে। এজন্যই দেশের ক্রান্তিকালে সরকার প্রচুর ব্যয় করে, প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করে যেন মানুষের হাতে হাতে টাকা পৌঁছে যায় এবং এই টাকা এক হাত থেকে আরেক হাতে ঘুরে ঘুরে বহুগুণ সমৃদ্ধি বয়ে আনে।

ঠিক এভাবেই, আপনার-আমার ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক ক্ষতি স্বীকার করে দেয়া কর্জে হাসানা নিশ্চিতভাবেই ১০ গুণের বেশি হয়ে অর্থনীতিতে ফেরত আসছে যার দ্বারা আমরা নিজেরাই উপকৃত হব। এভাবে কর্জে হাসানার উপস্থিতিতে ব্যবসা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দ্বারা কম-বেশি সকলেই উপকৃত হবে।

সামাজিক তাৎপর্য:

বাংলাদেশের ৯০ শতাংশের বেশি মানুষই মুসলিম। ইসলামে সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হওয়ায় সমাজের বড় একটি অংশ ফাইন্যান্সিয়াল সেবা থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। এই ধর্মপ্রাণ মুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য অর্থায়নের পছন্দসই বিকল্প ব্যবস্থা হতে পারে কর্জে হাসানা। আর কর্জে হাসানায় যেহেতু কোনো সুদ নেই সেহেতু এটি খুব সাশ্রয়ী। তাই নিম্ন আয়ের ব্যক্তিরাও কর্জে হাসানার দ্বারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহজেই অংশ গ্রহণ করতে পারে। এভাবে ফাইনান্সিয়াল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজের বড় অংশ সম্পৃক্ত হতে পারে (Financial Inclusion), ধনী গরিবের মধ্যকার সম্প্রীতি বৃদ্ধি পেয়ে সমাজ হতে পারে আরও বেশি সহযোগিতামূলক, অংশগ্রহণমূলক ও দায়িত্বশীল।কর্জে হাসানার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক তাৎপর্য হচ্ছে যারা কর্জে হাসানায় যুক্ত তারা মূলত পরোপকারী মানসিকতার নিয়ে কাজ করে থাকেন। দুনিয়াবি স্বার্থ জড়িত না থাকায় এই ঋণ ব্যবস্থায় ধনী ও ক্ষমতাশীল কর্তৃক দরিদ্রদের অর্থনৈতিক শোষণ করার হুমকি নেই যেমনটা প্রচলিত অর্থব্যবস্থায় আমরা অহরহ দেখে থাকি।

অনেকেই এই অভিযোগ করেন যে, যারা কর্জে হাসানা দিবেন তারা অর্থনৈতিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই দাবি আংশিক সত্য। বিনা সুদে কিংবা কোনো লভ্যাংশ ছাড়াই কর্জ দেয়া হচ্ছে, তাই কর্জ-দাতার আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে এতে কোনোই সন্দেহ নেই। কিন্তু, ব্যক্তির

আর্থিক এই ক্ষতি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক কল্যাণের হাত ধরে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়ে ফেরত আসে। দুইটা ছোট উদাহরণ দেই। উন্নত রাষ্ট্রগুলো কেন অনুন্নত রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে 'অনুদান' দেয় বা খুব অল্প সুদে ঋণ দেয়? এর কারণ হলো, উন্নয়ন অর্থনীতির আলোচনায় দেখা যায় যে, যদি আপনার দেশ উন্নত হয় আর পাশের দেশ অনুন্নত হয়, তাহলে সেই অনুন্নত রাষ্ট্রের রোগ-বালাই, দারিদ্র্য কিংবা বেকারত্ব আপনার দেশের উপরে অনেক প্রভাব ফেলে। এজন্য নিজের দেশের পাশাপাশি উন্নত রাষ্ট্রগুলো অনুন্নত রাষ্ট্র মেরামতে প্রচুর বায় করে। তারা যে টাকাটাই ব্যয় করুক না কেন, এর ফলে তাদের নিজেদের সুবিদা ও নিরাপত্তা বাড়ে বহুগুণে।

ব্যক্তি পর্যায়ে তাৎপর্য:

প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে সমাজের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। তাই কর্জে হাসানা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ করার পাশাপাশি আমাদের উচিত ব্যক্তি পর্যায়ে এর প্রয়োগ করা। যেমন ধরেন একজন বিশ্বস্ত আত্মীয় হঠাৎ বিপদে পড়ে গেছেন। আপনার কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা অবশ্যই অপরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠানের তুলনায় বেশি। কারণ আপনি তার স্বভাব চরিত্র, কর্জ ফেরত দেওয়ার ইচ্ছা এবং প্রয়োজন খুব ভালোভাবে জানেন। তাই প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘসূত্রিতার মধ্যে না গিয়ে আপনার থেকে আপনার আত্মীয় আরও সহজে এবং নিশ্চিতরূপে সাহায্য পেতে পারে যদি ব্যক্তি পর্যায়ে কর্জে হাসানার প্রয়োগ থাকে।

অনেকেই এই অভিযোগ করেন যে কর্জে হাসানা নিলে কেউ ফেরত দিতে চায় না। ফলস্বরূপ কেবল প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাধানের পরামর্শ দেয়। এই কথাটি সকল ক্ষেত্রে সত্য না। মনে করেন আপনার অধীনে একজন ব্যক্তি কাজ করছেন যেমন আপনার বাসার কাজের বুয়া বা গাড়িচালক অথবা আপনার প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী ইত্যাদি। এমন একজন ব্যক্তিকে কর্জে হাসানা দিলে আপনি পরবর্তীতে তার বেতন থেকে কর্জের সমপরিমাণ টাকা কেটে রাখতে পারবেন। উদাহরণস্বরূপ আপনার প্রতিষ্ঠানের দারোয়ানের বেতন মাসে ১০ হাজার টাকা। কোনো এক মাসে তার মায়ের অসুস্থতার কারণে আপনার নিকট ২ হাজার টাকা কর্জ চাইল। আপনি চাইলেই পারবেন তাকে ২ হাজার টাকা কর্জ দিয়ে পরের ৪ মাস তার বেতন থেকে ৫০০ টাকা করে কেটে রেখে দিতে। এই সামান্য কিছু টাকার সাময়িক প্রয়োজনের জন্য তিনি নিশ্চয়ই কোনো প্রতিষ্ঠানের প্রাতিষ্ঠানিক ফরমালিটি পূরণের দীর্ঘসূত্রিতায় যেতে চাইবেন না বা যাওয়া উচিত হবেও না। তাছাড়া একজন প্রতিষ্ঠানের তুলনায় তার কাছ থেকে কর্জ আদায় করার যোগ্যতা আপনারই বেশি।
কোনো ব্যক্তির থেকে টাকা আদায় নিয়ে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগলে আপনি পবিত্র কুরআনের বর্ণিত নীতি অনুসারে লিখিত চুক্তি এবং সাক্ষী গ্রহণ করুন (প্রকৃতপক্ষে মুসলিম হিসেবে প্রতিটি

ঋণের চুক্তির ক্ষেত্রেই আমাদের এমনটি করা উচিত)। অল্প পরিচিত কিংবা যার বিশ্বস্ততা সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত না, এমন ব্যক্তিদের কর্জ দিতে প্রয়োজন বোধে আপনি তাদের সম্পদ বা জমি বন্ধক (বা জামিন) নিতে পারেন।[1]

এভাবে কর্জ আদায় করার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ইনশাল্লাহ। অর্থাৎ, সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠান এসে সমাধান করে দিবে এমন না ভেবে আপনি আপনার নিজের জীবনে কর্জে হাসানার সফল প্রয়োগে মনোনিবেশ করুন।

ব্যক্তিগত পর্যায়ে কর্জে হাসানার বিশেষ একটি তাৎপর্য ব্যাখ্যা করছি যা আমাদের পারিবারিক জীবনের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। মনে করি, আলালের ঘরে মোট ৪ জন সন্তান আছে, যাদের মধ্যে সবার বড় জনের নাম দুলাল। ঢাকাতে পড়াশোনা করার উদ্দেশ্যে দুলাল তার বাবার কাছে টাকা চাইল। পারিবারিক জমি ২০ লক্ষ টাকায় বিক্রয় করে আলাল তার ছেলে দুলালকে ঢাকায় পড়াশোনা করার সুযোগ করে দিলেন। পড়াশোনা শেষ করে একদিন দুলাল চাকরি নিল এবং তার স্ত্রী সন্তান এবং বাবা-মায়ের খরচ বহন করতে লাগল। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, সে তার ছোট ভাই বোনের পড়াশোনার খরচ, বা ভরণপোষণ ইত্যাদির দায়িত্ব ঠিক মত নিল না। কেবল বাবা-মাকে খুশি করেই নিজেকে দায়িত্বমুক্ত মনে করল। এমন ঘটনা আমাদের সমাজের অনেক জায়গাতেই একটি বাস্তব চিত্র।

অনেকেই ভুলবশত মনে করতে পারেন, দুলাল তার জায়গা থেকে ঠিকই আছে। ভাই বোনের পড়াশোনার ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে কেউ বাধ্য নয়। আর দুলাল যেহেতু বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিয়েছে, সে তো এমনিতেই যথেষ্ট করছে। প্রকৃতপক্ষে আলাল ও দুলালের দ্বারা অনেক বড় একটি অন্যায় হয়ে গেল। ইসলামের দৃষ্টিতে একই পরিবারের সকল সন্তান বাবা-মায়ের থেকে সমান অধিকার প্রাপ্য। তাই এক সন্তানকে ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে বাদ বাকি সকলকে খালি হাতে রাখা জুলুম। সুতরাং, আলালকে প্রত্যেক সন্তানকে ২০ লক্ষ টাকা করে মোট ৮০ লক্ষ টাকা দান করে দিতে হবে নতুবা কাউকে আলাদা করে কোনো টাকা দেওয়া উচিত হবে না। কিন্তু এই ন্যায্যতা রাখতে গিয়ে কারো পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যাক কিংবা কেউ বিদেশে কাজ করার সুযোগ

না পাক অথবা ব্যবসা শুরু করতে না পারুক এমনটিও কাম্য নয়। এর একটি সহজ সমাধান হচ্ছে কর্জে হাসানা। কোনো বাবা যদি তার সন্তানকে ২০ লক্ষ টাকা কর্জে হাসানা দেয় তাহলে আর কোনো সন্তান বঞ্চিত হচ্ছে না। কারণ, সেই কর্জ ফেরত আসছে ও পরবর্তীতে সবাই সেই সম্পদ ব্যবহার করতে পারছে।

---

[1]বি. দ্র. বন্ধকি জমি বা বস্তু করতে হাসানা /ঋণদাতা ব্যক্তি ভোগ করতে পারবে না। যদি ঋণদাতা ব্যক্তি সেই জমি বা বস্তু থেকে উপকার লাভ করে সেটি সুদ হয়ে যাবে।

ব্যক্তি পর্যায়ে কর্জে হাসানার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হচ্ছে আত্মমর্যাদাপূর্ণ মানুষের অর্থায়ন করা। সমাজে সবাই টাকা খুঁজতে পারে না। অনেকেই অভাবে ভোগে কিন্তু মানুষের কাছে টাকা খুঁজতে তারা সংকোচ বোধ করে। একটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এমন গোপন অভাবী ব্যক্তিদের খুঁজে খুঁজে বের করা সম্ভব না। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমরা আমদের পরিচিত এই সকল ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পারি।

প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ বনাম কর্জে হাসানা:

বসনিয়া হার্জেগোভিনা, ইরান, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্র সহ বেশ কয়েকটি দেশে কর্জে হাসানাভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু করেছে। ইরানে মসজিদে মসজিদে ও গ্রামীণ জনপদে

বিপুল সংখ্যক কর্জে হাসানা ফান্ড গঠিত হয়েছে। এই ফান্ডসমূহ অত্যন্ত কার্যকরী এবং সকল মহল থেকে সুনাম অর্জন করেছে। সেই তুলনায় প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থনীতিবিদ মহল থেকেই বর্তমানে সমালোচনার মুখোমুখি হচ্ছে। তার অন্যতম প্রধান একটি কারণ হলো উচ্চ সুদের হার। আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে এই উচ্চ সুদের হার সমাজের সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে গুনতে হচ্ছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো ঝুঁকির দোহাই দিয়ে উচ্চ সুদ গ্রহণ করাকে যৌক্তিক মনে করলেও অনেক ক্ষেত্রেই এই ব্যয়বহুল ঋণের কিস্তি পরিশোধ করতে গিয়ে গ্রাহকরা পুনরায় ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে থাকেন। এভাবে বারবার নতুন ঋণ নিয়ে পুরাতন ঋণ শোধ করার চক্র চলতে থাকে। অর্থনীতির ভাষায় এটি চক্রাকার ঋণ নামেও পরিচিত। এই চক্রাকার ঋণ সুদে-আসলে ক্রমান্বয়ে বড় হয়ে যায় এবং এক পর্যায়ে গ্রাহক সর্বস্ব হারাতে বাধ্য হন। দারিদ্র্য বিমোচনে সুদ-ভিত্তিক ক্ষুদ্র ঋণের ব্যর্থতার অন্যতম একটি কারণ এটি।

কর্জে হাসানার সৌন্দর্য এই যে, এখানে মোট ঋণের সাথে সুদ যুক্ত হয় না। সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষ এর সুবিধা নিতে পারে। এমনকি সবচেয়ে দরিদ্র্য যে অংশের মানুষ অর্থায়নের কোনো সুযোগ পান না, তাদের জন্যও অর্থায়নের ব্যবস্থা করে দিতে পারে কর্জে হাসানা। আর এই ব্যবস্থায় যেহেতু সুদের ফাঁদ তৈরি হয় না; যোগ্য প্রার্থীরা সহজেই দারিদ্র্যসীমার থেকে বের হয়ে আসার সুযোগ পায়।

সুদ-ভিত্তিক প্রচলিত ক্ষুদ্রঋণ সংস্থাগুলোর আরেকটি সমস্যা হলো, অনেক সময় তারা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে জড়িত হয়ে ক্ষুদ্র ঋণের আড়ালে সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আগ্রাসন প্রচ্ছন্নভাবে চলতে থাকে। সেই তুলনায় কর্জে হাসানা খুবই আঞ্চলিক একটি সমাধান এবং

সকল ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের জন্য এর দরজা উন্মুক্ত। এখানে কর্জ-দাতা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবেন, কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে বিশেষ শর্ত আরোপ করতে পারবেন না। তাই আলাদা করে কাউকে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত করার সুযোগ নেই বললেই চলে।
কর্জে হাসানার এমন সৌন্দর্য উপস্থিত থাকার পরেও একটি দুঃখজনক বাস্তবতা হচ্ছে ইসলামি আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কিংবা সাধারণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোও কর্জে হাসানার বিস্তারে কাজ করছে না। প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো কর্জে হাসানা-কে CSR এর অংশ হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। এটা করতে পারলে শুধু জনগণের সমষ্টিই বয়ে আসবে না, বরং এর সাথে জড়িত সকলেই পাবেন আল্লাহর তায়ালার অশেষ প্রতিদান।

সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থা

এখন প্রশ্ন হলো, যদি সুদ বিলুপ্ত করা হয় তাহলে ব্যাংক পরিচালনার বিকল্প পদ্ধতি কী হবে?

সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিকল্প ব্যবস্থার ওপর আলোকপাত করার আগে কিছু মৌলিক বিষয় জেনে নেয়া জরুরি।

১. সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের বিকল্প অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য যদি এমন হয় যে, প্রচলিত ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রম যে প্রক্রিয়ায় চালিয়ে যাচ্ছে, বিকল্প প্রস্তাবেও তাদের কার্যক্রম কমবেশি ওই প্রক্রিয়াতে সম্পন্ন করতে হবে এবং সেগুলোর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের মাঝে কোনো পার্থক্য হতে পারবে না। তাহলে এই বিকল্প অনুসন্ধান অর্থহীন। কেননা, এখন পর্যন্ত যা কিছু হয়ে আসছে যদি সেটাকেই বহাল রাখতে হয়, তাহলে 'বিকল্প ব্যবস্থার' কোনো প্রয়োজন নেই।

বরং 'বিকল্প' অনুসন্ধানের উদ্দেশ্য হচ্ছে, বিদ্যমান বাণিজ্যিক পরিবেশে যেসব কাজ ব্যাংকের জন্যে আবশ্যক বা উপকারী সেগুলো সম্পন্ন করার জন্যে এমন কর্মপন্থা অবলম্বন করা, যেখানে শরিয়তের মূলনীতির প্রতিফলন ঘটবে। যা দ্বারা শরিয়তের অর্থনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য পুরণ হবে। এর বিপরীতে যেসব কাজ শরিয়তের মূলনীতির আলোকে জরুরি বা উপকারী নয় বা সেগুলোকে শরিয়তের মূলনীতির কাঠামোতে গড়ে তোলার সুযোগ নেই, সেগুলো উঠিয়ে দেওয়া।

২. যেহেতু সুদ নিষিদ্ধ করলে তার প্রভাব সম্পদ বণ্টনের পুরো ব্যবস্থার ওপর পড়ে, কাজেই কেউ যদি এ আশা করে যে, সুদের শারঈ বিকল্প ব্যবস্থা কার্যকর করা হলে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের লাভের হার তা-ই থাকবে যা বর্তমান সময়ের সুদনির্ভর অর্থব্যবস্থায় পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তার সেই স্বপ্ন ভুল হবে। বরং বাস্তব হলো, যদি ইসলামি বিধান সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হয়, তাহলে বর্তমান অনুপাতের মধ্যে অনেকগুলো বৃহৎ মৌলিক পরিবর্তন আসতে পারে। একটি আদর্শ ইসলামি অর্থব্যবস্থার জন্যে এই মৌলিক পরিবর্তনগুলো অনিবার্য কাম্য।

৩. বর্তমান সময়ের ব্যাংকগুলো যেসব সেবা দিয়ে যাচ্ছে, সেগুলোর সবচেয়ে বড় উপকারী দিক হলো, তা জনগণের বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত উদ্বৃত্তকে একত্র করে শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার সুযোগ করে দিচ্ছে। যা বর্তমান অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জরুরি। এই উদ্বৃত্তগুলো যদি প্রত্যেক মানুষের পকেটে বিক্ষিপ্তাকারে পড়ে থাকত, তাহলে সেগুলো দ্বারা শিল্প ও বাণিজ্যের বিস্তারে কোনো উপকার অর্জন করা যেত না। আর মনে রাখতে হবে, উদ্বৃত্ত সম্পদের অলস পড়ে থাকাটা যেমন শরিয়তের দৃষ্টিতেও কাম্য নয়, তেমনি যৌক্তিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাকে কল্যাণকর বলার সুযোগ নেই।

কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হলো, সেই উদ্বৃত্ত সঞ্চয়কে শিল্প ও বাণিজ্যে ব্যবহার করার জন্যে প্রচলিত ব্যাংক যে পন্থা অবলম্বন করেছে, তা ঋণের পন্থা। সেমতে ব্যাংক পুঁজিপতিদেরকে এভাবে উৎসাহ দিয়ে থাকে যে, তারা অন্যের আর্থিক উপকরণগুলো নিজেদের মুনাফার উদ্দেশ্যে এমনভাবে ব্যবহার করবে, যেন সেই আর্থিক উপকরণ থেকে উৎপাদিত সম্পদের সিংহভাগ অংশ তাদের নিজেদের হাতেই কুক্ষিগত থাকে। পুঁজির প্রকৃত মালিকগণ যেন উৎপাদিত সম্পদ থেকে যথাযথভাবে উপকৃত হওয়ার সুযোগ না পায়। এ কারণেই প্রচলিত ব্যাংকিং সিস্টেমে ব্যাংক হলো নিরেট এমন এক প্রতিষ্ঠান, যা স্রেফ পুঁজিপতিদের সঙ্গে আমানতকারীদের আর্থিক লেনদেন সম্পন্ন করিয়ে দেয়। আমানতকারীদের সেই অর্থ দিয়ে আদৌ কি ব্যবসা-বাণিজ্য হচ্ছে, বা সেখান থেকে কতটুকু মুনাফা বেরিয়ে আসছে, বা কে লাভ চুষে নিচ্ছে, আর কার ক্ষতি হচ্ছে-এর সঙ্গে ব্যাংকের কোনো সম্পর্ক নেই।

এর বিপরীতে ইসলামের রূপরেখার আলোকে ব্যাংক শুধু অর্থ লেনদেনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অবদান রাখবে না; বরং তার পরিবর্তে তাকে এমন এক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হতে হবে, যা আমানতকারী গ্রাহকদের সঞ্চয় একত্র করে তা সরাসরি ব্যবসায় বিনিয়োগ করবে। গ্রাহকের সঞ্চয় একত্র করবে, তারা সবাই সেই ব্যবসার সরাসরি অংশীদার হবে। তাদের সঞ্চয়ের পুঁজি দিয়ে পরিচালিত ব্যবসার লাভ-ক্ষতির সঙ্গে তারা নিজেরাও সরাসরি যুক্ত হবে। কাজেই সুদভিত্তিক ব্যাংকিংয়ের যেই বিকল্প ব্যবস্থা প্রস্তাব করা

হবে তার ওপর কেউ যদি এ আপত্তি তোলে যে, ব্যাংকের পূর্বের অবস্থান বিলোপ করে তাকে একটা স্বতন্ত্র ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়েছে। তাহলে এ আপত্তি ভুল হবে। কেননা, যে প্রয়োজন পূরনের জন্যে বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা হচ্ছে এই পদ্ধতি ছাড়া সেই প্রয়োজন পুরণ হতে পারে না।

৪. চতুর্থ কথা হলো, শত বছরের ধরে জেঁকে বসা কোনো ব্যবস্থা তুলে ফেলে তার জায়গায় অন্য একটি নতুন ব্যবস্থা চালু করতে গেলে অবশ্যই নানা রকম সমস্যা হবে। এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, যদি সেই ব্যবস্থার পরিবর্তন অনিবার্য ও অত্যাবশ্যক হয়, তাহলে সেই সমস্যাগুলোকে অজুহাত বানিয়ে নতুন ব্যবস্থাকে অগ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ অভিহিত করা কখনই সঠিক নয়। এ সময় আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি সেই সমস্যাগুলোর সমাধান খুঁজবেন। সমস্যার ভয়ে-আতঙ্কে অগ্রযাত্রা থামিয়ে দেওয়া ভুল।

ব্যাংকিংয়ের শরিয়তসম্মত পদ্ধতি

সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পর এখন আমরা সেই প্রস্তাবনাগুলো উপস্থাপন করছি, যা ব্যাংকিংকে শরিয়তের মূলনীতির আলোকে পরিচালিত করার জন্যে পেশ করা হচ্ছে। প্রথমে একটি কথা বুঝতে হবে। তাহলো, ব্যাংকের সম্পর্ক হয় দুতরফা। তার এক সম্পর্ক হলো সেসব লোকের সঙ্গে, যারা তাদের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখে। ব্যাংকের অপর সম্পর্ক হলো সেসব লোকের সঙ্গে, যাদেরকে ব্যাংক মূলধন সরবরাহ করে। উভয় ধরনের সম্পর্কের ব্যাপারে আমরা আলাদা করে আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।

ডিপোজিটরের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক

প্রচলিত সিস্টেমে ব্যাংকে যে টাকা জমা রাখা হয় তাকে এ সময়ের ব্যাংকিংয়ের পরিভাষায় 'আমানত' বলে, কিন্তু ফিকহের দৃষ্টিতে তা মূলত ঋণ। ইসলামি পদ্ধতিতে ব্যাংক পরিচালনা করতে হলে, গ্রাহকের সঙ্গে ব্যাংকের সম্পর্ক হবে শিরকাহ বা মুদারাবার সম্পর্ক। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে গ্রাহকের টাকা ব্যাংকের কাছে ঋণ হবে না; বরং তাদের সম্পর্ক হবে এমন যে, টাকা আমানতকারী হবে Jul رب)রাব্বুল মাল) তথা 'পুঁজিপতি', ব্যাংক হবে مضارب)মুদারিব) তথা 'ব্যবসায়ী', আর প্রদত্ত অর্থ হবে رأس المال (রা'সুল মাল) তথা 'বিনিয়োগকৃত মূলধন'-যার ওপর ব্যাংক কোনো নির্দিষ্ট হারে লাভ দিতে বাধ্য থাকবে না; বরং যা লাভ হবে তা একটি পূর্বনির্ধারিত অনুপাত অনুসারে দু' পক্ষের মাঝে বণ্টিত হবে।

লক্ষ্য করে দেখুন, বর্তমানেও ব্যাংক গ্রাহককে 'কারেন্ট অ্যাকাউন্ট' (চলতি অ্যাকাউন্ট)-এর ওপর কোনো সুদ দেয় না। ইসলামি পদ্ধতিতেও এ হিসাবের ওপর কোনো মুনাফা দেয়া হবে না। আর কারেন্ট অ্যাকাউন্টের অর্থকে মনে করা হবে, ডিপোজিটরদের পক্ষ থেকে ব্যাংককে প্রদত্ত সুদমুক্ত ঋণ। তবে অন্যান্য লাভজনক অ্যাকাউন্ট 'মুদারাবা' বা 'শিরকাহর অ্যাকাউন্টে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।কিন্তু ওই হিসাবগুলোকে মুদারাবা বা শিরকাহে রূপান্তরিত করতে গেলে কার্যক্ষেত্রে একটি সমস্যা দেখা দিতে পারে। তাহলো, শিরকাহর সাধারণ নিয়ম হলো, সমস্ত হিসাবধারীর টাকা একসাথে যুক্ত হয়ে একটি সম্মিলিত খাতে অন্তর্ভুক্ত হতে হয়। এবং একই সময়ে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ করে সমস্ত অংশীদারের মধ্যে লাভ-লোকসান বণ্টিত হয়ে যায়। এই নিয়ম ব্যাংকের বেলায় কার্যকর করা সম্ভব নয়। কেননা, এখানে মানুষের অর্থ জমাদান ও উত্তোলনের ধারাবাহিকতা নিয়মিত চলতে থাকে। ফিক্সড ডিপোজিট (স্থায়ী আমানত)-এর বেলায় যদিও টাকা উত্তোলনের মেয়াদ স্থিরকৃত থাকে, কিন্তু জমা রাখার সময়-ক্ষণ স্থিরকৃত থাকে না। প্রত্যেক গ্রাহক প্রতিদিন ফিক্সড ডিপোজিটের অ্যাকাউন্ট চালু করতে পারে। আর সেভিং অ্যাকাউন্ট (সঞ্চয়ী হিসাব)-এর ক্ষেত্রে টাকা উত্তোলন ও জমাদানের কোনো নির্দিষ্ট ও স্থিরকৃত সময় নেই।

এর একটি প্রস্তাবিত সমাধান হলো, এ ব্যবস্থা পরিবর্তন করা যেতে পারে। এভাবে যে, সবাইকে বাধ্য করা হবে, তারা একটি নির্দিষ্ট তারিখে টাকা জমা দেবে এবং নির্দিষ্ট তারিখেই ওঠাবে। আর শিরকাহর জন্যে এক মাস বা তিন মাসের একটি মেয়াদ নির্ধারণ করা যেতে পারে। প্রতিটি মেয়াদ শেষ হলে লাভ-লোকসান হিসাব করে গ্রাহকদের মাঝে বণ্টন করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু এ ব্যবস্থায় প্রথমত গ্রাহকের জন্যে ব্যাংকে অর্থ রাখাটা ঝামেলাপূর্ণ হয়ে যাবে। একই তারিখে অর্থ জমাদান ও একই তারিখে উত্তোলন আবশ্যক করা হলে ব্যাংকের ওপর চাপও বৃদ্ধি পাবে। যার ফলে ব্যাংক প্রচুর উদ্বৃত্ত সঞ্চয়ের সদ্ব্যবহার থেকে বঞ্চিত হবে।

এ জটিলতা এড়াতে বেশ কিছু মহল থেকে শিরকাহ ও মুদারাবার মুনাফা বণ্টনের আরেকটি প্রস্তাবনা এসেছে। যাকে অ্যাকাউন্টিংয়ের পরিভাষায় Daily Product Basis, আরবিতে "الحساب اليومى" বলে। বাংলায় বলা যায় 'প্রাত্যহিক উৎপাদনের অ্যাকাউন্ট' বলে। এ প্রস্তাবনার সারকথা হলো, অংশীদারদেরকে যখন ইচ্ছা বিশেষ মূলনীতি অনুসারে ব্যাংক থেকে অর্থ উত্তোলন করার বা জমাদানের স্বাধীনতা দেওয়া হবে। কিন্তু যখন এক শিরকাহর মেয়াদ শেষ হবে তখন দেখা হবে, এ মেয়াদে কী পরিমাণ টাকা কত দিন ব্যাংকে ছিল? আর প্রতি টাকায় প্রতিদিনের লভ্যাংশের গড় কত? তার ভিত্তিতে যে ব্যক্তির যত টাকা এ মেয়াদ চলাকালে যত দিন ব্যাংকে ছিল, তার হিসাব অনুযায়ী লভ্যাংশ বণ্টন করা হবে।

কিন্তু সমস্যা হলো, এ পদ্ধতিতে লভ্যাংশের বণ্টন হয় আনুষ্ঠানিক। শারঈ মূলনীতির আলোকে তার ওপর আপত্তি উঠতে পারে। কারণ, এ পদ্ধতিতে কারও প্রকৃত লাভের কিছু অংশ অন্যের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ ৬ মাস পর লভ্যাংশের বণ্টন হলো। এ ৬ মাসের প্রথম ৩ মাসে ব্যাংকের লাভ বেশি হয়েছে। শেষ ৩ মাসে কম হয়েছে। এই ৬ মাসের মেয়াদে যায়দের টাকা ব্যাংকে ৬ মাসই ছিল। কিন্তু উমরের টাকা শেষ ৩ মাস ছিল। এখন যদি প্রাত্যহিক হিসেব মেনে লভ্যাংশ সমান হারে ভাগ করা হয়, তাহলে এমতবস্থায় যায়দের প্রকৃত লাভের কিছু অংশ নিঃসন্দেহে উমরের মধ্যে চলে আসবে।

লভ্যাংশ বণ্টনের উল্লিখিত প্রস্তাবনার ওপর এ আপত্তি কার্যকর। তবে এভাবে তার উত্তর দেওয়া যেতে পারে যে, শিরকাহভিত্তিক ব্যবসার মাঝে অংশীদারদের মূলধন যৌথভাবে সংমিশ্রিত (مخلوط بالمشاع) হয়ে যায়। কাজেই মুনাফা বণ্টন করার সময় এটা বিবেচনা করা হয় না যে, প্রত্যেকের মূলধন থেকে প্রকৃত মুনাফা কী পরিমাণ হয়েছে; বরং সামষ্টিক মোট মূলধন থেকে যেই মোট লাভ হস্তগত হয় সেটাই সবার মাঝে বণ্টিত হয়। অথচ এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, একজনের মূলধন থেকে লাভ হয়েছে আর অন্যজনের মূলধন থেকে মোটেও লাভ হয়নি। বোঝা গেল, শিরকাহভিত্তিক ব্যবসায় লভ্যাংশের প্রকৃত বণ্টন আবশ্যক নয়, আনুষ্ঠানিক বণ্টনই যথেষ্ট। শর্ত হলো, বণ্টনের এ প্রক্রিয়ার ওপর সকল অংশীদারের সম্মতি লাগবে। কাজেই মুনাফা বণ্টনের প্রচলিত পন্থা ইসলামি শরিয়তের আলোকে অনুমোদনযোগ্য মনে হচ্ছে। বিশেষত টাকা জমাদানের সময় যখন প্রত্যেক ব্যক্তি এ তথ্য জানবে যে, লভ্যাংশ বণ্টিত হবে আনুষ্ঠানিকভাবে; কাজেই ধরে নেওয়া যায়, পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে লভ্যাংশ বণ্টনের একটি গাণিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে সমস্যা নেই।

উপরের প্রস্তাবনা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন কোনো ব্যক্তি মেয়াদের মাঝপথে ব্যাংকে প্রবেশ করবে বা মধ্যবর্তী সময়ে টাকা উত্তোলন ও জমাদান করবে। যদি কোনো ব্যক্তি মেয়াদের মাঝপথে ব্যাংক থেকে পুরোপুরি বের হয়ে যায়, তখন এ মাসআলা কার্যকর হবে না। এমতবস্থায় জটিলতা নিসরনের পদ্ধতি হলো এভাবে কারণ দর্শানো হবে যে, ব্যাংক এখন তার লভ্যাংশ বণ্টন করছে না; বরং এ ব্যক্তি ব্যবসা থেকে তার নিজের অংশ বিক্রি করছে এবং ব্যাংক তা ক্রয় করছে। আর অংশ ক্রয় করার জন্যে ব্যাংক লাভ-লোকসানের অবস্থা বিবেচনা করে তার অংশের মূল্য নির্ধারণ করছে।

ইসলামের আলোকে বিনিয়োগ পদ্ধতি:

এতক্ষণ ইসলামি ব্যবস্থায় ব্যাংক ও অর্থজমাদানকারীর পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে আলোচনা হলো। এখন ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ অর্থাৎ অর্থের জোগান ও মূলধন জোগানের ইসলামি পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। শরিয়তের দৃষ্টিতে তার কয়েকটি প্রক্রিয়া হতে পারে।

শিরকাহ ও মুদারাবা

শিরকাহ ও মুদারাবাই হচ্ছে সুদের বিপরীতে সঠিক ইসলামি বিকল্প পদ্ধতি। যা সুদের চেয়ে কয়েকগুণ ভালো ফলাফল বয়ে আনে। এটি পুঁজি বিনিয়োগের আদর্শ ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়সংগত পদ্ধতি। সম্পদ বণ্টনের ওপর এ পদ্ধতির প্রভাব ইতিবাচক। এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে ব্যাংকিং সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণা দূর হয়ে যাবে যে, ব্যাংক ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ড থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন রেখে শুধু পুঁজির সরবরাহের মাধ্যম হয়ে থাকে। শিরকাহ ও মুদারাবা ভিত্তিক অর্থব্যবস্থা চালু হলে ব্যাংকের পূর্বের অবস্থান পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তখন তার নাম ব্যাংক হোক, বা অন্য কিছু হোক, সে যথারীতি ব্যবসা পরিচালনা করবে।

শিরকাহ ও মুদারাবার মধ্যে মৌলিক পার্থক্য কী? এর উত্তর হলো, শিরকাহর মধ্যে অংশীদারগণ যেমন মূলধনের মধ্যেও শরিক হয়, তেমনি ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডের মধ্যেও শরিক হতে পারে। সেই সুযোগ তার আছে। কেউ যদি কার্যত ব্যবসার মাঝে হস্তক্ষেপ না করে, তাহলে তা ভিন্ন কথা। আর মুদারাবার মধ্যে দু' পক্ষ পুরোপুরি আলাদা। পুঁজি সরবরাহকারী মূলধন দেবে আর ব্যবসায়ী ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। পুঁজি সরবরাহকারী ব্যবসায়িক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করবে না।

এখানে আমরা শিরকাহ ও মুদারাবার এমন কয়েকটি মূলনীতি তুলে ধরব, শিরকাহ ও মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা করতে হলে, সেগুলো অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে।

১. শরিয়তের দৃষ্টিতে মূলধনের অনুপাতে লভ্যাংশ নির্ধারণ করা জায়েজ নয়। লভ্যাংশ নির্ধারণ করার সঠিক শরিয়তসম্মত পদ্ধতি হলো, বাস্তবে যে লাভ হবে তার শতকরা হার নির্ধারণ করতে হবে।

২. পারস্পরিক সন্তুষ্টির ভিত্তিতে মুনাফার যেকোনো আনুপাতিক হার চূড়ান্ত করা যাবে।

এ দুটি বিষয় উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। কারও মূলধন ৪০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও তার জন্যে ৬০ শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্ত করা এবং অন্যজনের মূলধন ৬০ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও তার জন্যে ৪০ শতাংশ লাভ নির্ধারণের শর্ত চূড়ান্ত করা জায়েজ। পুঁজির পরিমাণ অনুসারে লভ্যাংশ বণ্টন করা আবশ্যক নয়। বোঝা গেল, অংশীদারদের জন্যে ব্যক্তিভেদে মুনাফার ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। এ সময়ের পরিভাষায় এটাকে (Weightage) 'গুরুত্ব' দেয়া বলে। অিংশীদারদের একেকজনকে একেক রকম গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে। তবে যে অংশীদার কাজ না করার শর্ত দিয়েছে, তার পুঁজির অনুপাতের চেয়ে তার মুনাফা বেশি হতে পারবে না।

৩. লভ্যাংশের ক্ষেত্রে অংশীদারদের একেকজনকে একেক রকম গুরুত্ব দেয়া যেতে পারে, কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে এমন করার সুযোগ নেই। জায়েজ নয়। কেননা লোকসান সর্বাবস্থায় পুঁজির অনুপাতে হবে। বিষয়টিকে ফকিহ উলামায়ে কেরাম এভাবে বলেন,

الرِبّحُ عَلَى مَا اصْلَحُوْا عَلَيْهِ وَالْوَضِيْعَةُ بِقَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ

'লভ্যাংশের হার নির্ধারিত হবে নিজেদের সম্মতির ভিত্তিতে আর ক্ষতির হার নির্ধারিত হবে মূলধনের ভিত্তিতে।'

শিরকাহ ও মুদারাবার কিছু জটিলতা

শিরকাহ ও মুদারাবা চালু করা হলে সাধারণত দু-ধরনের জটিলতার কথা বলা হয়:

১. বর্তমান সময়ে সততা ও বিশ্বস্ততার স্তর অনেক নিচে নেমে গেছে। কাউকে শিরকাহর ভিত্তিতে মূলধন দেওয়া হলে দেখা যায়, সে কখনো প্রকৃত লাভের কথা বলে না; বরং লাভের স্থলে লোকসান দেখায়। এ কারণে শিরকাহ ও মুদারাবার ভিত্তিতে বিনিয়োগ করা কঠিন।

এর উত্তর হলো, আসলেই সমাজে অসততার চিত্র বেশ দুঃখজনক, কিন্তু অসততার কারণে কখনো কোনো কাজ বন্ধ হয় না। বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে সেই অসততার পথ রোধ করার চেষ্টা করা হয়ে থাকে। যেমন: অডিটের ব্যবস্থা, অ্যাকাউন্টসের ব্যবস্থা, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তদারকি ইত্যাদি। মুশারাকাহ ও মুদারাবার ক্ষেত্রেও এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে।

দ্বিতীয় প্রস্তাব হলো, যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অসততার অভিযোগ প্রমাণিত হবে, তাদেরকে সব ব্যাংকের পক্ষ থেকে কালো তালিকাভুক্ত করা যেতে পারে। যার অর্থ, এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে কোনো ব্যাংক থেকে মূলধন পাবে না। যদি আইনি প্রক্রিয়ায় এ প্রস্তাব কার্যকর করা যায়, তাহলে মানুষ অসততার আশ্রয় নিতে ভয় পাবে এবং বেশ বড় পরিসরে এ ধরনের অসততার পথ বন্ধ হয়ে যাবে।

এর বাইরে আরও কিছু আইনি পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে। তবে হ্যাঁ, ব্যাংকের একার পক্ষে এগুলো সামাল দেওয়া কঠিন; কিন্তু যদি সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয় এবং সবগুলো ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ এ নিয়ম মেনে চলে, তাহলে অসততার পথ বন্ধ করা সহজ হবে।

২. দ্বিতীয় জটিলতা দেখা দেয় ইনকাম ট্যাক্স ব্যবস্থার কারণে। সাধারণত ব্যবসায়ীগণ দু-ধরনের খাতা তৈরি করে। ইনকাম ট্যাক্সের জন্যে একটা খাতা তৈরি করে, আর প্রকৃত খাতা হয় এরচেয়ে ভিন্ন। এমতবস্থায় মুশারাকা বা মুদারাবার ভিত্তিতে মূলধন গ্রহণকারী যদি প্রকৃত লাভ দেখায়, তাহলে ইনকাম ট্যাক্সের লোকজন আটকে ধরবে। আর যদি সে ব্যাংককে প্রকৃত লাভ প্রদর্শন না করে তাহলে লাভের প্রকৃত বণ্টন হবে না।

এর উত্তর হচ্ছে, যদি সরকারের দায়িত্বশীলদের জায়গা থেকে এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, মুশারাকা ও মুদারাবা ব্যবস্থা সফল করার জন্যে ট্যাক্স প্রক্রিয়ার সংশোধন করা অত্যন্ত জরুরি। ট্যাক্সকে আমদানির সঙ্গে যুক্ত না করে সরকারি প্রয়োজন পূরণের জন্যে ট্যাক্সের এমন কোনো ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে, যার ফলে অসততার এ রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে।

তা ছাড়া অর্থ বিনিয়োগের অনেক এমন খাত রয়েছে যেখানে শিরকাহ ও মুদারাবার ফলে দীর্ঘ হিসাব-নিকাশের প্রয়োজন হবে না। যেমন: রপ্তানিকেন্দ্রিক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই রপ্তানিকৃত মালামালের উৎপাদন ব্যয় এবং সম্ভাব্য মূল্য জানা থাকে। সুতরাং এক্ষেত্রে শিরকাহ বা মুদারাবাভিত্তিক ব্যবসায় ধোঁকা-প্রতারণার সম্ভাবনা অনেক কম।

তা ছাড়া ব্যবসায়ীর পুরো কার্যক্রমের মাঝে ব্যাংকের পুরোপুরি শরিক হওয়াটাও আবশ্যক নয়। ব্যবসার কোনো নির্দিষ্ট অংশেও ব্যাংক অংশিদার হতে পারে, এমতবস্থায় লাভ নির্ধারণ বেশি কঠিন হবে না। এ ছাড়া ব্যাংকের জন্যে ব্যবসায়ীর সঙ্গে স্থায়ী ও সার্বক্ষণিক অংশিদার থাকা জরুরি নয়। এমনও হয়ে থাকে যে, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিরা তাদের মূলধন দালান নির্মাণ, যন্ত্রপাতি ক্রয় ইত্যকার খাতে পূর্ব থেকেই বিনিয়োগ করেছে। ব্যাংক ছয় মাস বা এক

বছরের জন্যে তার সঙ্গে শিরকাহর ভিত্তিতে লেনদেন করতে পারে। এ কারণে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এ চুক্তি হতে পারে যে, এই নির্দিষ্ট ও সীমিত অংশিদারত্বের মধ্যে ব্যবসার শুধু প্রত্যক্ষ ব্যয় (Direct Expenses) ধর্তব্য হবে আর মোট লাভ (Gross profit) উভয়পক্ষের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর যেহেতু স্থাবর সম্পত্তিগুলো ব্যবসায়ীর অর্থায়নে নির্মিত, কাজেই লাভের অনুপাতে তার অংশ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে; কিন্তু এই স্থাবর সম্পত্তির ব্যয় এবং পরোক্ষ ব্যয় অংশিদারিত্বের ওপর তুলে দেওয়া উচিত হবে না। এ পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে একদিকে হিসাব-নিকাশ সহজ হয়ে যাবে, অন্যদিকে অসততার আশঙ্কাও হ্রাস পাবে। আর ট্যাক্স যেহেতু পণ্যের লাভের ওপর প্রজোয্য হয়, কাজেই ট্যাক্সজনিত জটিলতারওও সমাধান বেরিয়ে আসবে। শিরকাহ ও মুদারাবাই প্রকৃত ইসলামি পদ্ধতি। তবে কিছু কিছু খাত আছে, যেখানে মুশারাকা বা মুদারাবা সম্ভব হয় না। যেমন ধরুন, ট্রাক্টর ক্রয়ের জন্যে একজন কৃষকের পুঁজি দরকার। এ ক্ষেত্রে শিরকাহ ও মুদারাবা সম্ভব নয়। এরূপ অবস্থায় বিনিয়োগের আরও কিছু প্রক্রিয়া আছে।

ইজারা (লিজিং সিস্টেম)

এটাও পুঁজি বিনিয়োগের একটি শরিয়ত নির্দেশিত পদ্ধতি, যাকে ইংরেজিতে 'লিজিং' (Leasing) বলে। "কোম্পানির জন্যে মূলধন সরবরাহ” শিরোনামের অধীনে এর বিবরণ আলোচিত হয়েছে। এখানে শুধু এ কথা স্পষ্ট করা হবে যে, শুধু 'ইজারা' শব্দ দেখে কোনো লেনদেনকে শরিয়তসম্মত ধরে নেওয়া সমীচীন হবে না। কারণ, বর্তমানে সাধারণত যেসব ইজারাভিত্তিক লেনদেন হয়ে থাকে, সেগুলোর মধ্যে ইজারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না। ইজারার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, ইজারাদাতা (Lessor) যেসব যন্ত্রপাতি ভাড়ায় দিচ্ছে সে তার মালিক ও দায়বহনকারী হবে; কিন্তু বর্তমানে বিনিয়োগ ইজারায় কার্যত এই মৌলিক বৈশিষ্ট্য মানা হয় না। ইজারাদাতা যন্ত্রপাতির কোনোপ্রকার দায় গ্রহণ করে না।

যন্ত্রপাতির কোনোপ্রকার ক্ষতি হলে তা ইজারা গ্রহণকারীর ক্ষতি বলে মনে করা হয়। এমনকি কোনো দুর্ঘটনায় যন্ত্রপাতি ধ্বংস হয়ে গেলে সে অবস্থাতেও ইজারাগ্রহীতাকে ভাড়া গুনতে থাকে। যন্ত্রপাতির সঙ্গে ইজারাদাতার শুধু এতটুকু সম্পর্ক যে, ইজারাগ্রহিতা ভাড়া পরিশোধ না করলে সে যন্ত্রপাতি বিক্রি করে নিজের পাওনা তুলে নেবে। কাজেই প্রচলিত লিজিং সিস্টেমটি ইসলামসম্মত ইজারা নয়। কেননা, এই লিজিং সিস্টেমের আসল উদ্দেশ্যে হলো, সুদের ওপর ঋণ প্রদান করা, শুধু ট্যাক্সের পরিমাণ কমাতে ইজারার নাম ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের লেনদেন শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ নয়।

হ্যাঁ, যদি প্রকৃতপক্ষে ইজারাদাতা যন্ত্রপাতির মালিক হয় এবং সে দায় বহন করে ইজারার চুক্তি করে, তাহলে তার অবকাশ রয়েছে। আর ভাড়া নির্ধারণ করার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যন্ত্রপাতির মূল্য কিছু লাভসহ যেন পরিশোধ হয়ে যায়। শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে এতে কোনো ক্ষতি নেই। কিন্তু চুক্তির মধ্যে এ শর্ত যুক্ত করা যাবে না যে, ইজারার মেয়াদ শেষ হওয়া মাত্রই যন্ত্রপাতি ইজারাগ্রহীতার মালিকানায় চলে যাবে। কারণ, এর ফলে " صَفْقَةٌ فِي صَفْقَةٍ" (চুক্তির ভেতর আরেক চুক্তি) এর অবস্থা তৈরি হয়, যা নিষিদ্ধ। তবে পূর্ব থেকে শর্ত না করে, মেয়াদ শেষ হওয়ার পর ইজারাগ্রহিতার কাছে যন্ত্রপাতির মালিকানা স্থস্তান্তরের সুযোগ রয়েছে

মুরাবাহা মুআজ্জালা

এটিও অর্থ বিনিয়োগের একটি শরিয়তসম্মত পদ্ধতি। যার প্রক্রিয়া হলো, যখন কেউ ঋণ নিতে আসবে তখন ব্যাংক জিজ্ঞেস করবে, কোন বস্তুর জন্যে অর্থ দরকার? ব্যাংক তাকে নগদ অর্থ না দিয়ে সেই বস্তু ক্রয় করে মুরাবাহা পদ্ধতিতে লাভের ওপর বাকিতে বিক্রি করে দেবে। যদিও এখানে দরদাম করে মুনাফা হিসেবে যেকোনো মূল্য নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে, কিন্তু লাভের নির্দিষ্ট হার নির্ধারণ করে মুরাবাহা এ জন্যে করা হয়, যেন নীতিমালার মধ্যে সমতা থাকে এবং সব গ্রাহক থেকে একই হারে লাভ উসুল হয়। লাভের যে হার নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় মার্ক আপ (Mark up)।

এটাও অর্থায়নের শরিয়তসম্মত পদ্ধতি। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, সঠিক শর্তে কার্যক্রম সম্পাদন করতে হবে। কারণ, বাকিতে বিক্রি হলে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করা ফকিহ উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে জায়েজ। ইসলামি ব্যাংকগুলোতে এ পদ্ধতি প্রচুর অনুসৃত হচ্ছে। তবে এটা যথেষ্ট নাজুক পদ্ধতি। সামান্যতম অসতর্কতা করা হলেই তা সুদি ব্যবস্থার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাবে। আজকাল ব্যাংকগুলোতে মুরাবাহার মূল প্রক্রিয়া না বুঝে এবং সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় শর্তাদি পূরণ না করে প্রয়োগ করা হচ্ছে। যার ফলে প্রচুর ত্রুটি সৃষ্টি হচ্ছে। সাধারণত ব্যাংকগুলো মুরাবাহাভিত্তিক লেনদেন করার সময় যে ত্রুটিগুলো করে থাকে-অথচ সঠিক শারঈ পদ্ধতিতে মুরাবাহা করতে হলে সেগুলো পরিহার করা অত্যাবশ্যক-সেগুলো এখানে চিহ্নিত করে দিচ্ছি।

প্রচলিত মুরাবাহার মধ্যে শারঈ ত্রুটিসমূহ

১. মুরাবাহার সঠিক প্রক্রিয়া হচ্ছে, ব্যাংক কোনো বস্তু ক্রয় করে লাভে (Mark up) বিক্রি করে দেবে। কিন্তু আমাদের দেশের ব্যাংকগুলোতে এমন ঘটনাও ঘটছে, যে বস্তুর ওপর

মুরাবাহার চুক্তি হয় সে বস্তু ঋণগ্রহীতার কাছে আগ থেকেই মজুদ থাকে। ব্যাংক সেই ঋণগ্রহিতার কাছ থেকে ওই বস্তু নগদে কম মূল্যে কিনে আবার তার কাছেই বাকিতে লাভ ধরে বিক্রি করে দেয়। এ প্রক্রিয়াকে পরিভাষায় 'বাই ব্যাক' (Buy Back) বলে। এ প্রক্রিয়াতে মুরাবাহার প্রকৃত পদ্ধতি অনুসরণ না করে,বরং লাভ (Mark up)-কে 'বাই ব্যাক'-এর সঙ্গে যুক্ত করে দেয়া হয়েছে, যা শরিয়তের মূলনীতি অনুসারে নাজায়েজ। কেননা, একই ব্যক্তি থেকে কম মূল্যে কিনে তৎক্ষণাৎ তার কাছে অধিক মূল্যে বাকিতে বিক্রি করা প্রকৃত বিচারে সুদি ঋণেরই একটি রূপ মাত্র। কেননা প্রথম কেনাবেচার সময়ই এ শর্ত থাকে যে, তার কাছেই পুনরায় বিক্রি করতে হবে।

২. কখনো কখনো এমনও হয়ে থাকে যে, ব্যাংকগুলো 'বাই ব্যাক' (Buy Back)-এর বৈধকরণ প্রক্রিয়াও বাস্তবে অনুসরণ করে না। তারা স্রেফ কাগুজে কার্যক্রম করেই লেনদেন সম্পন্ন করে ফেলে। অর্থাৎ, এমন কোনো পণ্য আগ থেকেই ঋণগ্রহিতার কাছে মজুদই থাকে না যার ওপর 'বাই ব্যাক' করা হচ্ছে। এমনকি প্রতিষ্ঠানের ব্যয়ের এমন খাত, যেখানে কোনো পণ্য কেনার সুযোগই নেই (যেমন: কর্মচারীদের বেতন দেওয়া, বকেয়া বিল পরিশোধ করা) ইত্যাদি এ ধরনের খাতের জন্যেও ব্যাংক থেকে মুরাবাহার ওপর ঋণ পাওয়া যায়।

৩. যদি ব্যাংক 'বাই ব্যাক' (Buy Back) পদ্ধতি অনুসরণ না করে, প্রকৃত মুরাবাহাই করে, তখনও দেখা যায়, ব্যাংক মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রীত পণ্য প্রথমে নিজের দখল ও দায়বদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসার বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয় না। অথচ মুরাবাহা বৈধ হওয়ার জন্যে শর্ত হলো, পণ্যটি প্রথমে ব্যাংকের দখল ও দায়বদ্ধতায় আসতে হবে।

৪. যখন কোনো ব্যক্তি ব্যাংকের কাছে মূলধন নিতে আসে তখন ব্যাংক অর্থ বিনিয়োগের সীমা নির্দিষ্ট করে দেয় যে, ব্যাংক এ পরিমাণ মূলধন মুরাবাহা করার জন্যে প্রস্তুত আছে। যাকে আরবিতে বলে تَحْدِيدُ السقف। সে মর্মে চুক্তির (Agreements) ওপর স্বাক্ষরও নেওয়া হয়। সে সময় ব্যাংক ওই ব্যক্তিকে পণ্য ক্রয়ের উকিল বানিয়ে দেয়, কিন্তু তখন কোনো ক্রয়-বিক্রয় সংঘটিত হয় না। এ সময় দু পক্ষের মাঝে স্রেফ এ চুক্তি হয় যে, ব্যাংক প্রয়োজন অনুসারে নিম্নোক্ত শর্তগুলোর ওপর গ্রাহককে তার প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে পাঠিয়ে দেবে।

এখানে আবশ্যক ছিল, যখন গ্রাহকের কোনো পণ্যের প্রয়োজন হবে তখন সে ব্যাংককে জানাবে। এরপর এটাই উত্তম পদ্ধতি ছিল যে, ব্যাংক সেই পণ্য নিজস্ব মাধ্যম দিয়ে কিনে প্রথমে নিজের দখলে নেবে। এরপর গ্রাহকের কাছে

মুরাবাহার ভিত্তিতে বিক্রি করবে। ব্যাংক যদি সে পদ্ধতি অবলম্বন না করে, তার স্থলে ওই গ্রাহককেই ক্রয়-বিক্রয়ের উকিল বানায়, তাহলে কমপক্ষে এতটুকু জরুরি যে, গ্রাহক ব্যাংকের উকিল হিসেবে সে বস্তু কেনার পর ব্যাংককে অবহিত করবে। এরপর ইজাব (ক্রয়ের প্রস্তাব) ও মঞ্জুরির মাধ্যমে ব্যাংকের কাছ থেকে নিজের জন্যে কিনে নেবে। এখানে গ্রাহকের দুটি অবস্থান পরস্পরে আলাদা রাখা জরুরি ছিল। প্রথমে সে ছিল উকিলের অবস্থানে। যতক্ষণ সে এ অবস্থানে থাকবে তার ওপর উকিলের বিধান প্রজোয্য হবে। শরিয়তমতে, তিনি যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের উকিলের অবস্থানে থাকবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত পণ্যটি ব্যাংকের মালিকানায় ও তার জামানতে তার নিয়ন্ত্রণে থাকবে। এ সময়ে যদি উকিলের অবহেলা ছাড়া, ভিন্ন কোনো কারণে ওই পণ্য নষ্ট হয়, তাহলে এর ক্ষতি ব্যাংকেরই হবে। এরপর যখন সে ব্যাংককে অবহিত করে সেই পণ্য তার থেকে নিজের জন্যে কিনবে, তখন পণ্যটি গ্রাহকের নিজস্ব মালিকানায় ও জামানতে আসবে। এমতবস্থায় পণ্য নষ্ট হলে তা গ্রাহকেরই হবে।

গ্রাহকের এ দুই অবস্থানের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকা, এবং একটি অপরটি থেকে স্বতন্ত্র হওয়া অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু আজকালকের ব্যাংকগুলো বিষয়টির প্রতি কোনো গুরুত্ব দেয় না; বরং অর্থ প্রদানের সীমা নির্ধারণ (Limit) অনুমোদন করার সময় মুরাবাহা চুক্তির ওপর যেই স্বাক্ষর হয়, সেই স্বাক্ষরকেই তারা যথেষ্ট মনে করে। এরপর গ্রাহক নিজেই পণ্য কিনে ব্যবহার করতে থাকে। ব্যাংক থেকে কেনার জন্যে পৃথকাকারে কোনো প্রস্তাব-মঞ্জুরি হয় না। যার ফলে এটা স্রেফ একটা কাগুজে কার্যক্রমে পরিণত হয়। বাস্তবে এটাই হয় যে, ব্যাংক প্রথমে গ্রাহককে অর্থ প্রদান করল। এরপর মেয়াদ শেষে অতিরিক্ত মুনাফা সমেত সেই অর্থ তুলে নিল। পণ্য ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণে আসা, এরপর তার মালিকানা গ্রাহকের কাছে হস্তান্তর হওয়া এবং এ উদ্দেশ্যে বিক্রয়ের প্রস্তাব ও মঞ্জুরি ইত্যাদির কোনো প্রক্রিয়ারই অনুসরণ হয় না। এ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে হারাম ও নাজায়েজ।

৫. ব্যাংক আরেকটি ভুল করে। তাহলো, যখন অর্থ প্রদানের সীমা (تحديد السقف) নির্ধারণ করে চুক্তি হয়, তখন ওই চুক্তির ওপর স্বাক্ষর হওয়ার সময়ই ব্যাংক গ্রাহক থেকে Bill of Exchange (বিনিময় বিল) বা প্রমিসারি নোটের ওপর স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। এটা ভুল। কারণ হলো, Bill of Exchange এর ওপর স্বাক্ষর তখন হয় যখন কোনো ব্যক্তি ঋণী হয় যায়। অথচ এ গ্রাহক এখনো ঋণগ্রহিতা হয়নি। এখন তো শুধু ভবিষ্যতে মুরাবাহ-মুআজ্জালা করবে, তার ওপর আগ্রহমূলক চুক্তি হলো। গ্রাহক তখনই ব্যাংকের কাছে ঋণী হবে যখন সে পণ্যটি ব্যাংকের কাছ থেকে নিজের জন্যে কিনবে। কাজেই প্রমিসারি নোটের ওপর তার স্বাক্ষর তখনই হওয়া উচিত, এর আগে নয়।

৬. সুদি অর্থব্যবস্থার প্রচলন হলো, ঋণ পরিশোধের সময় ঋণগ্রহীতা যদি ঋণ পরিশোধ করতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক হয়, তখন সেই ঋণের মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়া হয়। এমতবস্থায় পূর্বের সুদ ঋণের মধ্যে যুক্ত হয়ে তার ওপর অতিরিক্ত সুদ ধার্য করে সময় বাড়ানো হয়। পরিভাষায় এটাকে বলা হয় রুল ওভার (Roll Over) করা। মুরাবাহার মধ্যেও এ প্রচলন শুরু হয়ে গেছে। মুরাবাহার মূল্য পরিশোধের সময় চলে আসার পর গ্রাহক যদি মূল্য পরিশোধ করতে অক্ষম হয়, তখনও ঋণকে রুল ওভার করে দেয়া হয়। অথচ এটা ছিল একটা ক্রয়-বিক্রয়। এর মধ্যে পণ্যের একটি নির্দিষ্ট মূল্য ছিল। যেই মূল্যে পরবর্তী সময় বাড়ানো বা কমানোর সুযোগ নেই। এক মুরাবাহার ওপর আরেক মুরাবাহা করা যায় না। মুরাবাহার এই মৌলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ ও শর্তাদি পূরণ না করার কারণে এ জাতীয় অনেকগুলো ত্রুটি সৃষ্টি হচ্ছে। যার ফলে লেনদেনটি শরিয়তের দৃষ্টিতে জায়েজ থাকে না। তাই মুরাবাহা বাস্তবায়ন করার জন্যে তার সবগুলো শর্ত পূরণ করা অত্যন্ত জরুরি।

ঋণের দলিল

মুরাবাহা মুআজ্জালার মধ্যে পণ্যের দাম ক্রেতার ওপর ঋণ হয়ে যায়। কাজেই ব্যাংক ঋণের নিরাপত্তা দলিল (الوثيقة) হিসেবে কাফালত (জামানত) বা রেহেন (বন্ধক) দাবি করতে পারে। বর্তমানে বন্ধকের অনেকগুলো পদ্ধতি প্রচলিত আছে। এর শারঈ বিধান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আমার আরবি গ্রন্থ "أَحْكَامُ الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيط।"-এর মধ্যে রয়েছে। এখানে তার সারসংক্ষেপ পেশ করা হলো।

মূল্যের নিরাপত্তার জন্যে বিভিন্ন প্রক্রিয়া অবলম্বন করা যেতে পারে:

১. বিক্রীত পণ্যকেই নিরাপত্তা দলিল হিসেবে নিজের কাছে রাখা হচ্ছে। এর বিধান হলো, মূল্য পরিশোধের জন্যে বিক্রীত পণ্য আটক করে নিজের কাছে রাখা জায়েজ নয়। কারণ, বাইয়ে মুআজ্জালের (বাকি বিক্রি) ক্ষেত্রে বিক্রেতার এ অধিকার নেই যে, সে বিক্রীত পণ্য আটকে রাখবে। ২৩ তবে বিক্রীত পণ্য বন্ধক হিসেবে নিজের কাছে রাখতে পারে। শর্ত হলো, ক্রেতা পণ্য নিজ নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর বন্ধক হিসেবে বিক্রেতাকে দেবে। ২৪ বিক্রীত পণ্য আটক আর বন্ধকের মধ্যে পার্থক্য হলো, পণ্য আটক রাখার পর খোদ পণ্যই অর্থের জামানত হবে। যাকে আরবিতে বলে مضمون بالثمن । পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। আর বন্ধকের ক্ষেত্রে পণ্যটি মূল্যের জামানত হবে। যাকে আরবিতে বলে, مضمون بالقيمة। পণ্য নষ্ট হয়ে গেলে বিক্রয়চুক্তি রহিত (فسخ)হবে না।

২. বর্তমানে বন্ধকের আরেকটি পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। যাকে 'সিম্পল মর্টগেজ' (Simple Mortgage("الرهن الساذج" তথা 'সাধারণ বন্ধক' বা 'ফ্লোটিং চার্জ' (Flaoting Charge("الذمة السائلة" বলে। যার প্রক্রিয়া হলো, বন্ধক রেহেনদাতার নিয়ন্ত্রণে থাকে। সে তা ব্যবহারও করতে থাকে। রেহেনগ্রহীতা বন্ধক হস্তগত করে না। তবে রেহেনগ্রহীতার অধিকার থাকে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ঋণ শোধ না করলে সে তা বিক্রি করে ঋণ উসুল করতে পারবে। আর রেহেনদাতা ঋণ পরিশোধের পূর্বে বন্ধকি পণ্য নিজে ব্যবহার করতে পারবে বটে; কিন্তু তার মালিকানা তৃতীয় কারো কাছে হস্তান্তর করতে পারবে না।

বন্ধকের এ প্রকারের ওপর আপত্তি উঠতে পারে, এ ক্ষেত্রে বন্ধকি বস্তুর দখল বন্ধকগ্রহীতার কাছে স্থানান্তরিত হয় না। অথচ বন্ধক শুদ্ধ হওয়ার জন্যে বন্ধকি বস্তু বন্ধকগ্রহীতার হাতে আসা জরুরি, কিন্তু কিছু কারণে (যার বিবরণ আলোচ্য গ্রন্থে আছে) বন্ধকের এ প্রকার জায়েজ মনে করা হয়।

৩. ঋণের নিরাপত্তার একটা উপায় হলো, তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে জামিনদার বানানো। এ পদ্ধতিকে ফিকাহর পরিভাষায় কাফালত (كفالة) বলে। যা জায়েজ। ফকিহগণ এ পদ্ধতি বিস্তারিত বিধান লিখেছেন। কিন্তু এ কার্যক্রমের ওপর পারিশ্রমিক বা ফিস নেওয়া শরিয়তমতে, জায়েয নয়।

ঋণ পরিশোধের বিলম্বে জরিমানা

সুদি অর্থব্যবস্থায় নিয়ম হলো, ঋণগ্রহিতা ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে সুদ বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলশ্রুতিতে ঋণগ্রহীতা ভয়ে সময়মতো ঋণ শোধ করে দেয়; কিন্তু মুশারাকা, মুদারাবা বা মুরাবাহার মধ্যে এ নিয়ম নেই। এ সুযোগের অপব্যবহার করে মানুষ ঋণ শোধ করতে বিলম্ব করে। এর প্রতিকার কী? বিষয়টি এ সময়ের আলেমদের আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

এতটুকু কথা চূড়ান্ত যে, অভাবের কারণে ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করলে তার বিধান কী হবে, তা কুরআন ঘোষণা করে দিয়েছে:

"وَإِنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ

যদি খাতক অভাবগ্রস্থ হয়, তবে তাকে সচ্ছলতা আসা পর্যন্ত সময় দেয়া উচিত।"

অর্থাৎ ঋণগ্রহীতার ওপর কোনো জরিমানা আরোপ না করে আরও সময় দিতে হবে। কিন্তু যদি সে টালবাহানা শুরু করে, অর্থাৎ পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও অকারণে বিলম্ব করে, তাহলে তার প্রতিকারের উপায় কী?

১. বর্তমান সময়ের কিছু আলেম বিলম্বের ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতার ওপর ক্ষতিপূরণ (Compensation) আরোপ করা জায়েজ বলেছেন। কিছু ব্যাংকে এ ফতোয়ার ভিত্তিতে কার্যক্রম পরিচালনা চলছে। এর প্রক্রিয়া প্রণয়ন করা হয়েছে এভাবে, প্রথমে তার টালবাহানা যাচাই করার জন্যে এক মাস পর্যন্ত তাকে নোটিশ দেয়া হবে। যদি এর মধ্যে সে ঋণ পরিশোধ না করে, তাহলে দেখা হবে, সে যত দিন বিলম্ব করেছে তত দিন পর্যন্ত ব্যাংকের 'ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে' (حساب الاستثمار)কত লাভ হয়েছে। সে হিসেবে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ করে তাকে পরিশোধ করতে বলা হবে। এ টাকা সরকার পাবে না; ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ ব্যাংক পাবে। যেমন: ব্যাংকের ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টে শতকরা ৫ ভাগ লাভ হলে ঋণের শতকরা ৫ ভাগ তাকে ক্ষতিপূরণ হিসেবে জমা দিতে হবে। যদি এ সময়ে ব্যাংকের কোনো লাভ না হয়, তাহলে তার থেকেও কিছু নেওয়া যাবে না।

কিন্তু অধিকাংশ আলেম 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ'-এর প্রক্রিয়াকে সমর্থন করেন না। কারণ, এর বৈধতার পক্ষে উপস্থাপিত দলিলগুলো ত্রুটিপূর্ণ। (আমার "أَحْكَامُ الْبَيْعِ بِالتَّقْسِيطِ" গ্রন্থে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে)। এ প্রক্রিয়ার দলিলাদি শারঈ দৃষ্টিকোণ থেকে যেমন ত্রুটিপূর্ণ, তেমনি কার্যক্ষেত্রেও ফলদায়ক নয়। কারণ, এ পদ্ধতি অবলম্বন করলে ঋণগ্রহীতার ওপর ঋণ পরিশোধের চাপ পড়বে না। কারণ, ইনভেস্টমেন্ট অ্যাকাউন্টের লাভ সাধারণত অল্প হয়। এর বিপরীতে মুরাবাহার হার হয় অনেক বেশি। কাজেই কেউ দীর্ঘ মেয়াদের ওপর অধিক হারে মুরাবাহার ওপর চুক্তি না করে, স্বল্প মেয়াদের ওপর মুরাবাহাভিত্তিক ঋণ দিয়ে তা পরিশোধে বিলম্ব করতে পারে। এমতবস্থায় সে 'আর্থিক ক্ষতিপূরণ' স্বীকার করে নেবে। যার ফলে তার নিজের ওপর কোনো চাপ পড়বে না; বরং বিষয়টি তার কাছে লাভজনকই মনে হবে।

এমন প্রেক্ষাপটে বিলম্বের পথ বন্ধ করার একটি কার্যকর পন্থা আমি প্রথম উপস্থাপন করেছিলাম। যা যথেষ্ট সমাদৃত হয়েছে। তা হলো, মুরাবাহ বা ইজারার এগ্রিমেন্টের মাঝে ঋণগ্রহীতা এ কথাও লেখবে, 'যদি আমি ঋণ পরিশোধে বিলম্ব করি, তাহলে এত টাকা কোনো সেবামূলক খাতে ব্যয় করতে বাধ্য থাকব।' ঋণের আনুপাতিক হার আমলে নিয়ে সেই অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা যেতে পারে। এ ধরনের টাকা দিয়ে একটি সেবামূলক ফান্ডও গঠন করা যেতে পারে। এ ফান্ড থেকে যেমন কাউকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া যাবে। তদ্রূপ এখান থেকে মানুষকে বিনা সুদে ঋণও দেয়া যাবে। কিন্তু এ টাকা ব্যাংকের আয়ের

তালিকায় গণ্য হবে না। এ পদ্ধতি অধিক কার্যকর। কারণ, এ পদ্ধতিতে টাকার হার নির্দিষ্ট নেই। কাজেই অধিক হারেও নির্ধারণ করা যেতে পারে। এর ফলে ঋণগ্রহীতার ওপর চাপ পড়বে।

এর বৈধতা হলো, এ টাকা যেমন জরিমানাও নয়, তেমনি সুদও নয়; বরং এটি হচ্ছে, ঋণগ্রহীতার পক্ষ থেকে নিজের ওপর অনিবার্যকরণ। শরিয়তের পরিভাষায় এটাকে " يمين اللجاج" বলে। ইমাম খাত্তাবি রহ. তাঁর " تحرير الكلام في مسائل الالتزام" গ্রন্থে নিজের ওপর অনিবার্যকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করে লিখেছেন,

اما اذا التزم المدعى عليه للمدعى انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا فهذا لا يختلف في بطلانه لأنه صريح الربا ---- إلى قوله : وأما إذا التزم انه إن لم يؤفّه حقه فى وقت كذا فعليه كذا لفلان أو صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب، فالمشهور أنه لا يقضى به كما تقدم وقال ابن دينار يقضى به (ص : ١٧٦- طبع بيروت(

যদি ঋণগ্রহিতা নিজের ওপর ঋণদাতার জন্যে কোনো কিছু আবশ্যক করে এভাবে যে, যদি সে তার প্রাপ্য যথাসময়ে প্রদান না করে তাহলে সে তাকে এটা-ওটা দেবে, তাহলে তা বাতিল হওয়ার ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই। কারণ, এটা স্পষ্ট সুদ।

আর যদি সে এরূপ আবশ্যক করে যে, যদি সে তার প্রাপ্য যথাসময়ে পরিশোধ না করে, তাহলে সে এ পরিমাণ অর্থ অমুককে দেবে বা গরিবকে সাদকা করবে। এ ক্ষেত্রে মতভেদ রয়েছে। প্রসিদ্ধ অভিমত হলো সে তা পূরণ করবে না। যেমন পেছনে আলোচিত হয়েছে। ইবনে দিনার বলেন, সে তা পরিশোধ করবে।

বোঝা গেল, সর্বসম্মতিক্রমে এই অত্যাবশ্যকীয়করণ অন্তত দিয়ানাতান তথা নৈতিকভাবে জরুরি। তবে কাজাআন অর্থাৎ আইনিভাবে জরুরি কি-না, তা নিয়ে মতভেদ আছে। বর্তমান সময়ের প্রয়োজনীয়তা লক্ষ্য করে ওইসব মনীষীর কথার ওপর আমল করতে বাধা নেই-যারা আইনিভাবেও তা অত্যাবশ্যক মনে করেন।

সময়ের পূর্বে পরিশোধে ঋণহ্রাস

ঋণগ্রহীতা যদি নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তার ঋণ শোধ করে, তাহলে সুদি অর্থব্যবস্থায় সুদ হ্রাস পায়। প্রশ্ন হলো, এ ধরনের পরিস্থিতিতে মুরাবাহার মূল্য হ্রাস করার সুযোগ আছে, কি নেই?

এই মাসআলার দুটি দিক আছে।

১. এক দিক হলো, যাকে ফকিহগণ "ضع وتعجل" পরিভাষায় ব্যক্ত করেন। অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা তার ঋণদাতাকে বলবে, তুমি ঋণ কমিয়ে নির্ধারিত সময়ের আগে গ্রহণ করে নাও। এর বিধান কী হবে, তা নিয়ে ফকিহদের মাঝে প্রচুর বিতর্ক রয়েছে। অধিকাংশ ফকিহের মতে এটা নাজায়েজ। এটাই বিশুদ্ধ (বিস্তারিত দেখুন " أحكام البيع بالتقسيط" গ্রন্থ)।

২. পরবর্তীকালের কিছু হানাফি আলেম মুরাবাহা মুআজ্জালাভিত্তিক ব্যবসায় নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ঋণ পরিশোধ করা হলে মূল্য হ্রাস করা জায়েজ বলেছেন।

সমস্যা হলো, ব্যাংকগুলোকে যদি এর গণসুযোগ দেয়া হয়, তাহলে মুরাবাহা ও সুদি লেনদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। তাই আমার দৃষ্টিতে সমীচীন হলো, চুক্তির মধ্যে এ কথা লেখা থাকবে না যে, আগে পরিশোধ করলে মূল্য কমে যাবে। হ্যাঁ, যদি কোনো ব্যক্তি সময়ের আগেই শোধ করে, তখন কোনো পূর্ব সিদ্ধান্ত ব্যতিরেকেই কমিয়ে দিতে নিষেধ নেই।

ইসলামি বিনিয়োগ পদ্ধতির শাখাগত সমন্বয়

এতক্ষণ পর্যন্ত বিনিয়োগের এমন কিছু মৌলিক পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা হলো, যা শরিয়তের মূলনীতি সমর্থিত। এখন লক্ষণীয় হলো, ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে এসব পদ্ধতির সমন্বয় হবে কীভাবে? যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যাংকের একেকটি ছোট ছোট লেনদেনের ক্ষেত্রেও অর্থায়নের উক্ত পদ্ধতিগুলো কার্যকর না করা হবে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রয়োগিকভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করা কঠিন। এজন্যে এখন ব্যাংকের শাখাগত লেনদেনের ওপর সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করা হচ্ছে। ব্যাংক কর্তৃক অর্থায়নের তিনটি পদ্ধতি আছে। অর্থায়নের সেই তিন পদ্ধতিকে শারঈ কাঠামোতে গড়ে তোলার জন্যে লক্ষ্য করতে হবে যে, এখানে ইসলামের কোন অর্থায়ন-পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে?

প্রজেক্ট ফাইন্যান্সিং (تمويل المشاريع") তথা 'প্রকল্পের অর্থায়নের' মতো খাতে শিরকাহ, মুদারাবা, ইজারা ও মুরাবাহা সব পদ্ধতিতেই বিনিয়োগ করা যেতে পারে। ইজারা হবে এভাবে যে, ব্যাংক যন্ত্রপাতি ক্রয় করে ভাড়ায় দেবে। মুরাবাহা হবে এভাবে যে, যন্ত্রপাতি ক্রয় করে লাভ নির্ধারণ করে বিক্রি করে দেবে। দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে শিরকাহ ও মুদারাবা পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিংتمويل رأس المال العامل

এর মতো বিশেষ লেনদেনের ক্ষেত্রে মুশারাকা ও মুদারাবা হতে পারে। যেমন: ব্যাংকের দেওয়া মূলধন দিয়ে তুলা ক্রয় কিনবে। এর দ্বারা কাপড় প্রভৃতি তৈরি করে যে লাভ হবে, ব্যাংক তার মধ্যে শরিক হবে। আর কাঁচামালের প্রয়োজন হলে সেক্ষেত্রে মুরাবাহাও হতে পারে।

ওভার হেড এক্সপেনসেস Overhead Expenses (যেসব ব্যয় সরাসরি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়, যেমন: বেতন প্রদান, ভাড়া-জাতীয় বিলের পরিশোধ ইত্যাদি)। এ ধরনের খাতে অর্থায়ন বেশ কঠিন। এখানে ইজারা ও মুরাবাহার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবে দুটো পথই আছে।

একটা হলো মুশারাকা পদ্ধতি। প্রতিষ্ঠানের যত টাকার প্রয়োজন ব্যাংক তত টাকা দিয়ে ব্যবসার কোনো অংশে অংশিদার হবে। যখন শিরকাহ বা অংশিদারিত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠান টাকা পেল তখন সে ব্যবসার যেকোনো প্রয়োজনে সে অর্থ ব্যয় করতে পারে।

দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে বিনা সুদে ঋণ প্রদান। বিনা সুদে ঋণ দেওয়া সত্ত্বেও ব্যাংক সেই ব্যায়ভারের অর্থ গ্রহণ করতে পারে, যা এই ঋণের হিসাব-নিকাশ রাখার প্রয়োজনে ব্যয় করেছে। এক্ষেত্রে যদিও মৌলিক বিধান হলো, প্রকৃত ব্যয়ভারই নিতে পারবে। যেহেতু আলাদাকারে প্রতিটি ঋণের প্রকৃত ব্যয় সম্পর্কে অবগত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তাই মনে করি, এখানে এ অবকাশ আছে যে, ব্যাংক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রমের 'পরিমিত পারিশ্রমিক(أجرت مثل) আদায় করবে। পরিমিত পারিশ্রমিক থেকে অতিরিক্ত আদায় করবে না। এর নজির হলো, ফতোয়া দিয়ে পারিশ্রমিক নেওয়া না-জায়েজ। [2]কিন্তু ফতোয়া লিখে

[2] পরিমিত পারিশ্রমিক হলো, স্বাভাবিক বাজার মূল্য আমলে নিয়ে শ্রমের পারিশ্রমিকের অংক নির্ধারণ করা

তার পারিশ্রমিক নেয়া জায়েজ আছে। এখানে ফকিহগণ মাসআলা লিখেছেন, লেখার পারিশ্রমিক 'পরিমিত পারিশ্রমিক'(أجرت مثل)ছাড়িয়ে যেতে পারবে না।

রিবার বিকল্প বাস্তবায়নে চ্যালেঞ্জসমূহ

ইসলামী অর্থনীতির একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণ। কুরআন ও হাদিসে রিবার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়েছে, এবং ইসলামী সমাজব্যবস্থায় এর কোন স্থান নেই। ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল চালিকাশক্তি তাই সুদভিত্তিক লেনদেন পরিহার করে শরিয়া-সম্মত বিকল্প পদ্ধতিকে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। তবে একটি প্রচলিত, সুদনির্ভর আর্থিক কাঠামোর মধ্যে থেকে সুদবিহীন ব্যবস্থা বাস্তবায়ন সহজ নয়।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল ও মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দেশে রিবার বিকল্প বাস্তবায়নে একাধিক প্রাতিষ্ঠানিক, নীতিগত, সামাজিক এবং কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ রয়েছে। শরিয়া-ভিত্তিক আর্থিক চুক্তিগুলো বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে অনেক সময় প্রথাগত ব্যাংকিং কাঠামোর সাথে সাংঘর্ষিক অবস্থা সৃষ্টি হয়। এছাড়া জনসচেতনতার অভাব, প্রশিক্ষিত জনবল সংকট, দুর্বল শরিয়া সুপারভিশন এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছার ঘাটতি এ প্রক্রিয়াকে আরও জটিল করে তোলে।

তবে এই চ্যালেঞ্জসমূহ সত্ত্বেও রিবার বিকল্প বাস্তবায়নকে অগ্রসর করার প্রচেষ্টা থেমে নেই। বিশ্বব্যাপী ইসলামি অর্থনীতির সাফল্য ও জনপ্রিয়তা আমাদের আশাবাদী করে তোলে যে সঠিক নীতিগত পরিকল্পনা, আর্থিক উদ্ভাবন এবং ধর্মীয় ও পেশাগত দক্ষতার সমন্বয়ে রিবা-বিহীন একটি বাস্তবায়নযোগ্য অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলা সম্ভব।

১. অভিজ্ঞ ও প্রশিক্ষিত জনবলের ঘাটতি

ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত জনবল প্রয়োজন, যারা শরিয়া, অর্থনীতি ও ব্যাংকিং—এই তিন ক্ষেত্রেই দক্ষ।

অধিকাংশ ব্যাংকার প্রচলিত (কনভেনশনাল) ব্যাংকিং থেকে আসা, যার ফলে শরিয়া ভিত্তিক ব্যবস্থাপনার প্রাথমিক ধারণাও অনেকের অনুপস্থিত।

২. জনসচেতনতার অভাব

গ্রাহকরা ‘সুদমুক্ত’ বলেই ব্যাংক ব্যবহার করলেও শরিয়া ভিত্তিক চুক্তির মূল দর্শন বা কাঠামো সম্পর্কে জানেন না।

ফলে গ্রাহক-ব্যাংক সম্পর্ক যথাযথ শরিয়া ভিত্তিক চুক্তির আলোকে পরিচালিত না হয়ে কেবল বাহ্যিক কাঠামোতে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিগত কাঠামো সীমিত

দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ম-কানুন মূলত প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা ঘিরে তৈরি।

ইসলামি ব্যাংকের জন্য আলাদা ও শক্তিশালী নিয়ন্ত্রক কাঠামো এখনো গড়ে ওঠেনি, ফলে শরিয়া পরিপালন তদারকি কঠিন হয়।

৪. শরিয়া অডিট ব্যবস্থার দুর্বলতা

শরিয়া নিরীক্ষা বা অডিটের কোনো বাধ্যতামূলক ও মানসম্পন্ন কাঠামো নেই।

ফলে ব্যাংকগুলো তাদের কার্যক্রমে কতটা শরিয়া সম্মত তা যাচাই করা কঠিন।

৫. ফিনান্সিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের ঘাটতি

রিবার বিকল্প চুক্তিগুলো বাস্তবায়নে সফটওয়্যার, অটোমেশন ও ইসলামি ফিনটেক এখনো সীমিত।

উদাহরণ: মুরাবাহা বা ইজারা চুক্তি ট্র্যাক করার স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল ব্যবস্থা দুর্বল।

৬. পুঁজিবাজার ও মুদ্রানীতিতে সুদের প্রভাব

দেশের পুঁজিবাজার, সরকারি ট্রেজারি বিল, সঞ্চয়পত্র ইত্যাদি সব সুদভিত্তিক। ইসলামী ব্যাংকগুলোর জন্য শরিয়া ভিত্তিক বিনিয়োগের সুযোগ সীমিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মুদ্রানীতিও সুদ ভিত্তিক, যা ইসলামি ব্যাংকের অর্থনীতি পরিচালনায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

৭. আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার বাধ্যবাধকতা

সুদনির্ভর আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং ও পেমেন্ট সিস্টেমে ইসলামি ব্যাংকগুলো অনেক সময় শরিয়া বিরোধী লেনদেনে অংশ নিতে বাধ্য হয়।

৮. ব্যবসায়িক চাপে শরিয়া নীতিতে নমনীয়তা

প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার জন্য কিছু ইসলামি ব্যাংক প্রচলিত ব্যাংকের মত পণ্য সরবরাহ করে, কেবল নাম পরিবর্তন করে শরিয়া সম্মত বলে দাবি করে।

৯.কর্জে হাসানার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ না থাকা

কর্জে হাসানার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ না থাকার কারণে কর্জ দাতার কর্জের সুরক্ষার অভাব এবং কর্জ গ্রহিতার সক্ষমতা যাচাই-বাছাই করা একজন ব্যক্তির পক্ষে কষ্টসাধ্য বিষয়। এই কারণে অনেকে কর্জ দিতে অনিহা প্রকাশ করে।কর্জে হাসানার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ থাকলে কর্জে হাসানার পদ্ধতিটা সহজ হয়ে যায় দাতা ও গ্রহিতা উভয়েরই জন্য।

উপসংহার ও সুপারিশসমূহ

আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক কাঠামো সুদের (রিবা) উপর দাঁড়িয়ে বিস্তৃত হলেও ইসলাম একে মানবতার বিরুদ্ধে একটি ভয়াবহ শোষণমূলক প্রথা হিসেবে ঘোষণা করেছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে রিবা শুধু নিষিদ্ধই নয়, বরং তা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধের শামিল। এই গবেষণায় আমরা রিবার বিভিন্ন রূপ, তার সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিণতি এবং ইসলামি বিকল্প পদ্ধতিগুলো বিশ্লেষণ করেছি।

রিবা একটি পদ্ধতিগত শোষণ যেখানে সম্পদ ধনী শ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়, দরিদ্র শ্রেণী হয় আরও নিঃস্ব। ফলে সমাজে বৈষম্য, অসাম্য এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টি হয়। ইসলাম এই অসাম্য দূর করতে সুদবিহীন, সম্পদভিত্তিক ও ন্যায়ভিত্তিক লেনদেন পদ্ধতি প্রবর্তন

করেছে। মুশারাকা, মুদারাবা, মুরাবাহা, ইজারা ইত্যাদি চুক্তির মাধ্যমে ইসলাম এমন একটি আর্থিক কাঠামো গড়ে তুলেছে যেখানে বিনিয়োগ হয় বাস্তব সম্পদ ও ঝুঁকি ভাগাভাগির মাধ্যমে।

গবেষণায় এটি প্রতীয়মান যে, ইসলামি ব্যাংকিং ও আর্থিক ব্যবস্থা একদিকে যেমন শরিয়াহ্-সম্মত, অন্যদিকে তা বাস্তবায়নযোগ্য এবং আধুনিক আর্থিক চাহিদাও পূরণে সক্ষম। বিশ্বব্যাপী ইসলামি অর্থনীতির বিকাশ ও জনপ্রিয়তা এরই প্রমাণ। তবে কিছু চ্যালেঞ্জ যেমন—শরিয়াহ্ সচেতনতা, মানসম্পন্ন মানবসম্পদ, এবং প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে সমন্বয়—এখনো বড় প্রতিবন্ধক।

সর্বোপরি, রিবার অনৈতিক ও শোষণমূলক চরিত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামি অর্থনীতি একটি মানবিক, ন্যায়ভিত্তিক ও কল্যাণমুখী বিকল্প প্রস্তাব করে, যা কেবল মুসলিম সমাজে নয়, বরং বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সমাধানে একটি কার্যকর পথ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই ইসলামি অর্থনৈতিক পদ্ধতির বাস্তবায়ন, গবেষণা ও প্রসার আরও বাড়ানো জরুরি।

সুপারিশসমূহ

১. রিবা নিষিদ্ধকরণে আইনগত পদক্ষেপ জোরদার করা:
সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংককে ইসলামি শরিয়াহ্ অনুযায়ী সুদভিত্তিক লেনদেন নিষিদ্ধ করতে কার্যকর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করতে হবে।

২. ইসলামি ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক মডেলের প্রসার:
ইসলামি ব্যাংকিং সেবার পরিধি বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিগত সহায়তা ও বিশেষ প্রণোদনা প্রয়োজন। সাধারণ ব্যাংকিং ব্যবস্থায় ইসলামি উইন্ডো চালু করে ধীরে ধীরে রিবা-ভিত্তিক কার্যক্রম বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া উচিত।

৩. আর্থিক শিক্ষা ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি:
রিবা ও ইসলামি বিকল্প লেনদেন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, গণমাধ্যম এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও প্রচার কার্যক্রম বাড়াতে হবে।

৪. শরিয়াহ্ পরিপালনে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি:
শরিয়াহ্ ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য দক্ষ ইসলামি অর্থনীতিবিদ, শরিয়াহ্ বিশেষজ্ঞ ও ব্যাংকার তৈরি করতে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার সুযোগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫. ব্যবহারিক গবেষণা ও উন্নয়ন (R&D) বাড়ানো:
রিবার বিকল্প লেনদেন পদ্ধতি এবং ইসলামি অর্থনৈতিক মডেলগুলোর উপর গবেষণা ও পরীক্ষামূলক প্রয়োগ বাড়ানো উচিত, যেন সেগুলোর কার্যকারিতা মূল্যায়ন করে বাস্তবায়নে সহজতা আনা যায়।

৬. সরকারি ও বেসরকারি খাতে সুকুক ও ইসলামি বন্ড চালু:
দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও বিনিয়োগ বাড়াতে সুদমুক্ত ইসলামি বন্ড (সুকুক) ব্যবহারের পরিধি বাড়ানো যেতে পারে।

৭. আন্তর্জাতিক ইসলামি অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা:
অন্যান্য ইসলামি দেশ ও সংস্থার সঙ্গে আর্থিক সহযোগিতা, অভিজ্ঞতা বিনিময় ও যৌথ বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করা দরকার।

৮. রিবা নির্ভর আন্তর্জাতিক চুক্তি ও ঋণ পর্যালোচনা:
IMF, World Bank বা অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে শরিয়াহ্ অনুযায়ী পর্যালোচনা ও বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

এই সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন করা গেলে একটি ন্যায়ভিত্তিক, টেকসই এবং শোষণমুক্ত ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে, যা শুধু মুসলিম উম্মাহ নয়, গোটা বিশ্ব অর্থনীতির জন্য একটি কার্যকর বিকল্প হয়ে উঠতে পারে।

তথ্যসূত্র

পত্রিকা :মাসিক আল কাওসার

সকল আয়াত ও অনুবাদ Quraan Shareef Online - পবিত্র কুরআন বাংলা অনুবাদ সহ http://www.quraanshareef.org/

IOM এর PDF

বই: ইসলাম ও আধুনিক অর্থনীতি (মুফতি তাকি   উসমানী হাফি.)

সুদ হারাম কর্জে হাসানা একটি সমাধান(মোহাইমিন পাটোয়ারী)